ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ।। ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১ ডিসেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

আর এস এস সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না ঃ মদন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী শাখা মালেগাঁও বিস্ফোরণ বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন বিতর্কের পাঁক আমদানি করছে। যদিও তারা বিস্ফোরণে কোনও এক হিন্দু গোষ্ঠী জড়িত বলে দাবি করছে, তবুও পুঙ্খানুপুঙ্খ ও পেশাদার ভিত্তিতে তদন্তের কাজ পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক। বলতে কষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে, একমাস ব্যাপী তদন্ত বিভিন্ন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তি-ব্যক্তির সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মালেগাঁও তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে শ্রুতিকটুভাবে তথাকথিত 'হিন্দু সন্ত্রাস' আবিষ্কার করে আর এস এস এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস হচ্ছে। আর এস এস কখনও সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না বা সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না — এটাই আর এস এস-র বিশ্বাস ও নীতি। আইন-কানুন মেনে চলা এক শৃঙ্খলাপরায়ণ সংগঠন হিসেবে আর এস এস-ও চায় ঘটনার আনুপূর্বিক ও পেশাদার ভিত্তিতে তদন্ত করে সত্যকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করা হোক।

আমরা 'হিন্দু সন্ত্রাস' বা হিন্দু জেহাদ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এইরকম প্রচারের কারণ হল সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও দেশজুড়ে ঘটে চলা জেহাদি সন্ত্রাসবাদকে আড়াল করা। আমরা সরকার, সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, রাজনৈতিক সুযোগ-সন্ধানী কাজ -কর্মের ফলে দেশের জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক বড় মূল্য দিতে হতে পারে। এখন মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বাহিনী (ATS) এক নতুন দিক উদ্ভাবন করেছে। তারা আর এস এস-এর সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) মোহন ভাগবত এবং কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর বরিষ্ঠ সদস্য ইন্দ্রেশ কুমারকে মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা হত্যা করতে চেয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন। আমরা আশা করব এ টি এস এবিষয়ে আরও গভীরভাবে তদন্ত করবে। তারা তদন্তের এক একটা অংশকে সংবাদমাধ্যমের একাংশের কাছে যেন ফাঁস না করেন। সরকার সকল নাগরিকের জীবন রক্ষার প্রতি

(এরপর ১৬ পাতায়)

ব্যর্থতা ঢাকতেই কেন্দ্রের 'হিন্দু সন্ত্রাস' তত্ত্বের আমদানি

সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া 'মকোকা' ধৃতরা হিন্দু বলেই কি?

গূঢ়পুরুষ ।। মালেগাঁও বিস্ফোরণে হিন্দু সমাজসেবী সংগঠনের নেতাদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সংবাদ মাধ্যমের মারফৎ ব্যাপক প্রচার চালিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনে মুসলিম ভোটদাতাদের সমর্থন পেতে চাইছে। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল যে মুম্বাই অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের গোয়েন্দাদের হঠাৎ অতি সক্রিয় হওয়াটা আদতে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এখন সেই সন্দেহের কালো বিড়ালটি এ-টি-এস গোয়ন্দাদের ঝুলি থেকে বেরিয়েছে। মুম্বাই এ-টি-এসের প্রধান হেমন্ত কারকারে জানিয়েছেন যে সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর, স্বামী দয়ানন্দ পাণ্ডে, সমীর কুলকার্ণি, লেঃ কর্ণেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিতসহ মোট ১০ জনকে মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অব অরগানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট (MCOCA) আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিশেষ দমনমূলক আইনে আটক অভিযুক্তদের বিনা বিচারে ৬ মাস জেলবন্দি রাখা যায়। এই সময়ে অভিযুক্তরা নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণে আদালতে যেতে পারবেন না অথবা আদালত তাঁদের জামিন দিতে পারবে না। অর্থাৎ আগামী ৬ মাসের মধ্যে মুম্বাই এ-টি এস-র গোয়েন্দাদের আদালতে তথ্য প্রমাণসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার দায়-দায়িত্ব থাকছে না। আর এই সময়ের মধ্যেই লোকসভার নির্বাচনও শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তারপর উপযুক্ত প্রমাণ নেই এই অজুহাতে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মুক্তি দিলেই হবে।

মনে রাখতে হবে যে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে এই প্রথম MCOCA আইনে গ্রেফতার করলো। এই আইনটি বিজেপি-শিবসেনা মোর্চার সরকার প্রণয়ন করেছিল। পরবর্তীকালে ক্ষমতায় এসে রাজ্য কংগ্রেস ঘোষণা করে MCOCA আইনটি হিমঘরে পাঠানো হয়েছে। কারণ, এই আইনটি মানবাধিকার বিরোধী। কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত 'উপা' সরকার একই যুক্তিতে গুজরাতের মোদী সরকারের 'গুজরাত কন্ট্রোল অব অরগানাইজড্ ক্রাইম বিল' স্বাক্ষর না করে ফেরৎ পাঠাতে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলকে পরামর্শ দেয়। এখন দেখা যাচ্ছে হিমঘরে পাঠানো তথাকথিত মানবাধিকার বিরোধী দমনমূলক আইনটিকে খুঁজে বের করে মহারাষ্ট্র সরকার হিন্দু নেতাদের সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগিয়ে তাঁদের বিনা বিচারে আটক করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুম্বাই-এ লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, নাগপুরে আর এস এস কার্যালয়ের সামনে বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কোনও ঘটনাতেই মহারাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে MCOCA আইনটি প্রয়োগ করেনি। তবে কী অতীতের সমস্ত সন্ত্রাসবাদী হামলায় মুসলিম জেহাদিরাই গ্রেফতার হওয়ায় এই বিশেষ আইনটি মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার ব্যবহার করেনি অথবা করতে চায়নি? অনেকের হয়তো জানা নেই যে মহারাষ্ট্রের এই বিশেষ আইনটি দিল্লীসহ সমস্ত কেন্দ্র শাসিত রাজ্যেই চালু আছে। এইসব রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিরোধে MCOCA আইনটি ব্যবহার করা যায়। অথচ গত ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীর "বাটলা হাউসে" সিমি ওরফে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের সন্ত্রাসবাদীদের

(এরপর ৪ পাতায়)

ভাষণরত শ্রীসুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নির্বাচনের প্রাক্কালে নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতেই কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব খাড়া করেছে এবং হিন্দু সমাজকে বদনাম করার নোংরা খেলায় মেতেছে। গত ২৩ নভেম্বর লক্ষ্ণৌতে সঙ্ঘের 'অবধ প্রান্ত' (উত্তরপ্রদেশে)-এর স্বয়ংসেবকদের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। কোনও সংস্থা বা সম্প্রদায় বিশেষকে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়। কেননা সন্ত্রাসবাদীরা নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। সুতরাং তারা মানুষই নয়। আর এস এস প্রধান আরও বলেন, দেশ জুড়ে একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে চলেছে। ইউ পি এ সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

শ্রী সুদর্শন বলেন, এখন যেহেতু সাধারণ নির্বাচন আসন্ন তাই একটি সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের ভোট পেতে চাইছে। আর এস এস সর্বদা আইন মেনে চলে এবং শান্তি ও সমন্বয়ের পক্ষে। সেজন্য সঙ্ঘের বক্তব্য হল, বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পেশাদারী ভিত্তিতে হোক এবং সর্বসমক্ষে সত্য প্রকাশ করা হোক। সেইসঙ্গে নির্দোষ লোকেদের হয়রানি বন্ধ করা হোক। শ্রীসুদর্শন আরও বলেন শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজ যে সংগঠিত হবে, তার লক্ষ্মণ রামসেতু রক্ষা আন্দোলন এবং জম্মুর অমরনাথ সঙ্ঘর্ষ সমিতির আন্দোলনে দেখা গেছে। আর এস এস গত ৮৩ বছর ধরে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে আসছে। শ্রীসুদর্শন অন্ধভাবে পশ্চিমী পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য ইউপিএ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। যার ফল এখন দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস গান্ধীজীর গ্রাম ভিত্তিক অর্থনীতির ধারণাকে পরিত্যাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন সময়ের দাবি হল গ্রাম-কে কেন্দ্র করে আর্থিক বিকাশ।

জঙ্গলমহলে জনজাতিদের এই বিদ্রোহ কেন?

বিশেষ সংবাদদাতা ।। লালগড় জঙ্গলমহলে জনজাতিদের এই বিদ্রোহ কেন, শুধুই কি পুলিশের অত্যাচার না অন্য কিছু। আসলে বামফ্রন্ট সরকার 'গরিবের সরকার' বলা হলেও তা কেবল প্রচারের বিজ্ঞাপনে রয়ে গেছে। সরকার গরিবদের অগ্রাধিকার দেয় বলা হলেও সেই অগ্রাধিকার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৩৪ হাজার প্রাচীন উপজাতি লোধা-শবর-সাঁওতালদের মাথার উপর একটা ছাদের ব্যবস্থা করতে পারেনি। গরিবের সরকার বলা হলেও গরিব মানুষের এই সমস্যার কথা ৩১ বছরেও বামপন্থী সরকার বোঝেনি। কেবল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৭৪৯৮টি গ্রামের মধ্যে ১৪০০ গ্রাম পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ আমলাশোলের থেকেও পিছিয়ে পড়া। আর এই গ্রামগুলি তপশীলি জাতি, উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। তার মধ্যে ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেই রয়েছে এক হাজার গ্রাম। ঝাড়গ্রাম মহকুমার ২৪৯০টি গ্রামের মধ্যে প্রায় অর্ধেক গ্রামই পিছিয়ে পড়া। মহকুমার ১২৯৯টি গ্রাম জনজাতি অধ্যুষিত। যা আই টি ডি পি গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত। এখানে মোট জনসংখ্যা ১১,৪৪,০০০। এর মধ্যে অতি অনগ্রসর সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ৫,৮০,০০০। লোধা শবর সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচীন উপজাতি মানুষের সংখ্যা ১৯,৯২৩। এই কুড়ি হাজার লোধা-শবর মানুষের কল্যাণের জন্য

রণং দেহি মূর্তিতে সশস্ত্র জনজাতিরা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে সরকারি বেসরকারি অনেক টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২৩টি ব্লকে লোধা-শবর জনসংখ্যা প্রায় ৪৭ হাজার। জেলার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর মহকুমায় জনজাতিদের বসবাস বেশি। এদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৫৫৯.৫৪ একর আর চাষ অযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৮৬.৪২ একর। সরকারি ও বেসরকারি বহু টাকা বরাদ্দ হলেও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। জনজাতি ছেলেমেয়েদের বিশেষভাবে শিক্ষাদানের জন্য জেলাভিত্তিক একটি করে আবাসিক স্কুল তৈরি হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলায় স্কুল উদ্বোধন হলেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় তা হয়নি। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের ট্রেনিং এবং উৎপাদন প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৪টি কেন্দ্র রয়েছে। ওই কেন্দ্রগুলিতে জনজাতি পুরুষ মহিলারা টেলারিং, কাঠের কাজ, তসর প্রশিক্ষণ নিত। কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এভাবেই চলছে অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ। জনজাতি সমাজের ভিতরে অসন্তোষের আগুন বহুদিন ধরেই জ্বলছিল। তাঁরা বহুদিন ধরেই বিক্ষুব্ধ নানান কারণে। ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের টাকা থেকে শুরু করে বি পি এল তালিকাভুক্তদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যের বিতরণ পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতির

(এরপর ৪ পাতায়)

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কেউই সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না — গত ২ নভেম্বর দিল্লীতে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত। শ্রীভাগবত 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছিলেন। সেমিনারের উদ্যোক্তা সঙ্ঘের দিল্লী শাখার সম্পর্ক বিভাগ। শ্রীভাগবত ভাষণের আগে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'হিন্দু এবং সন্ত্রাসবাদ' শব্দ দুটি পরস্পর বিরোধী। এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিই সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না।

শ্রীভাগবত আরও বলেন — বর্তমানে আমাদের দেশের নিরাপত্তা সংকটাপন্ন। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা পূর্ব থেকে পশ্চিম এক সবুজ চ্যানেল গড়ে তুলছে। আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে লাল-অঞ্চল গঠনের কাজ চালাচ্ছে নকশালবাদীরা। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ব মানচিত্রে উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল ভারতেরই সহযোগিতায়। অথচ সেদেশে আজ ভারত বিরোধী বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ চলছে। বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু দেশ নয়।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়নি। উপরন্তু আমাদের দেশের কিছু রাজনৈতিক নেতা তাদেরকে 'সম্মানীয় অতিথি' মনে করছেন, তাদেরকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা তুলছেন।

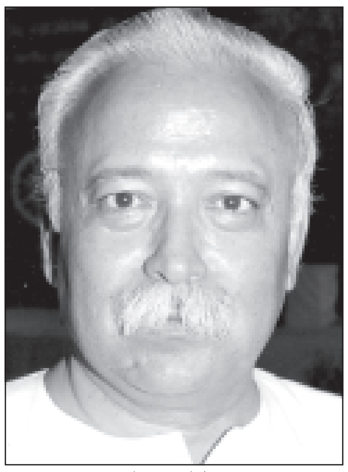

মোহন ভাগবত

প্রতিবেশী দেশ চীনের গতিবিধি ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে শ্রীভাগবত উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, তিব্বতের গুরুত্ব না বুঝেই আমরা তা চীনের দখলে যেতে দিয়েছি। এখন তো চীনা ফৌজ তিব্বতকে ঘাঁটি করে, আমাদের দেশের সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। যে নেপালের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ভ্রাতৃত্ব রয়েছে সেখানেও ক্ষমতা বদলের পর চীনা বুলি আওড়ানো হচ্ছে।

এদেশের সংস্কৃতি অনেক পুরাতন। এখানে অনেক ভাষা, ভাষী, অনেক জাত-পাত, পন্থ-সম্প্রদায় রয়েছে। এ দেশের সংস্কৃতি পরস্পরকে সংযুক্ত করে। সম্পর্ক বিভাগের চিকিৎসক গোষ্ঠী ওই আলোচনা সভার মূল আয়োজক। ২৫০ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ক্ষেত্র প্রচারক রামেশ্বরজী, প্রাক্তন ক্ষেত্র প্রচারক দীনেশজী, দিল্লী প্রান্ত প্রচারক প্রেমকুমার এবং অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ পি কে দভে উপস্থিত ছিলেন।

মার্কসবাদী লিলিপুটেরা লুটেপুটে খাচ্ছে গ্যালিভার বনছে মমতা

বিশাখা বিশ্বাস

ধান-পিটুলি নবান্নের স্বপ্নসাধ সব ভুলে টাটাবাবুদের স্কাই-কিসিং বিল্ডিংয়ে দিব্যি ঝাড়পোঁছ করতেন সিঁদুরে টিপ্‌পরা সিঙ্গুরের গেরস্ত বৌ — বাবুদের জিন্‌স্‌পরা ছেলে-ছোকরাদের সহাস্য গালটেপায় খানিক সলাজ হাসি সংগোপনে হেসে নিতো কুমারী কিশোরীরা। তাদের সেই স্বপ্নের রঙমহলকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিয়ে 'ন্যানো'-কে তাড়ালো মমতা। চারশ একর জমিতে প্রমোটারী শিল্প হল না, ভেঙে খান্ খান্ হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল স্বপ্নের ইন্দ্রধনুর মায়াজাল, পার্টি-শিল্পের হল সর্বনাশ, রাজার পর্দা ২৪ ঘন্টায় তাই সর্বক্ষণের হা-হুতাস। রাক্ষসী মমতা!...

সুহৃদ-বান্ধব দত্ত-মালিকদের সাথে নিয়ে ত্রিশটি বছর ধরে দিব্যি ঝোলেঝালে তেলেজলে চক্‌চকে হচ্ছিলেন সাম্যতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী পথে ধনতন্ত্রে ভোল্ বদলের ভোলানাথেরা। সুহৃদ-বান্ধব দত্ত-মালিকেরা জেলায় জেলায় তোলা তুলতো, অপহরণ করতো, ধর্ষণ করতো, খুন করতো। সেই বান্ধবেরাই মরূদ্যানের জেলায় জেলায় 'চারদিক দিয়ে ঘিরে লাইফ হেল' করে দিত, প্রতিবাদী মহিলাদের 'পাছা' দেখাতো, মানুষকে 'দমদম দাওয়াই' দিতো, প্রতিবাদীদের 'আড়ংধোলাই' দিতো, হলদিয়ায় পেলে বিরোধী-বিধায়কদের পা ভেঙে দিতো, রাজ্য জুড়ে 'ডু ইট নাউ' সংস্কৃতির পাশাপাশি মদ্য সংস্কৃতির জন্ম দিতো। সেই প্রাণের বান্ধবদের নানান প্রতিবাদে নানান অপবাদে সারা বাংলার মুক্তমঞ্চ হতে কারার অভ্যন্তরে পাঠালো বিরোধীদের আন্দোলন। 'ন্যানো' আগে ছিল না, পরেও হলো না, হওয়ার আশা নাই — এসো তাই চব্বিশ ঘন্টায় কেঁদে-কঁকিয়ে চোখের পাতা ভেজাই। 'দত্ত'-র শোকে 'মালিকের' দুখে বিনয় কাঁদেন, বিমান কাঁদেন, তত্ত্ব শোনান ইয়েচুরি — হায় কমরেড হল কী, ঘোর কলিতে বাঘকে খেলো ছুঁচোতে, কমরেডদের পায়ে মমতারা পরালো বেড়ি। ডাইনী মমতা।.....

সেই মমতারই সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মোকাবেলায় নরঘাতী নারকীয়তার পূর্বাহ্ণ ও পূর্বাভাসে উন্নয়ণের পরাজিত সেই সেনাপতি বঙ্গীয় বুদ্ধ মেঠো 'বুদ্ধু-লড়াকুর' মেজাজ নিয়ে আগেই বলে রেখেছেন, একটা ফ্রন্টে হেরেছি, কিন্তু যুদ্ধ চলবে। অতএব, 'যুদ্ধ চলবে'। চাষীর সোনার ক্ষেত গায়ের জোরে গায়েব করে পুঁজিপতির পায়ে উপঢৌকন পাঠাবার যুদ্ধে আমরা হেরেছি, এবার কুৎসার যুদ্ধ চলছে। কেউ বলছেন, দিদি দিদিমা হয়ে যাবেন কিন্তু জিততে ওকে দেবো না। কেউ বলছেন, রক্তমাংসহীন মমতা তো আসল মানুষ নয়! অতি সম্প্রতি ১৬।১১।০৮ আবার কেউ বললেন, বাংলার মায়েরা তাদের মেয়ের নাম আর 'মমতা' রাখবেন না। অর্থাৎ আন্দোলন করছে সব বিরোধী দল কিন্তু ওরা দেখছেন সর্বত্র মমতা, রাক্ষসী মমতা, সর্বনাশী মমতা।....

আসলে রাজার পার্টির ক্যারিকেচারে যারা নিন্দিত হয়েছে, শাসকদলের পদসেবার জলসাঘরে যারা উপেক্ষিত হয়েছে, অন্যলোকে কোনকালেই তারা কোনওদিন উপেক্ষিত হয়নি। তাদের উদয়াচল জানা যায় না, অজানা থেকে যায় তাঁদের অস্ত শিখরী — তবু, অত্যাচারিতের অন্তরলোকে কোনকালেই তারা স্থানহারা হয় না। তাই বিমানেরা আবিষ্কার করে ফেলেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম এবং লালগড়ের এই বিস্ফোরণ একই ডালের আলাদা আলাদা ফুল (২-১১-০৮ সময় সন্ধ্যা)। অস্যার্থ ঃ মমতা ও তার সহযোগী দলগুলিই (যাদের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক একটি গোষ্ঠীর নকশালরাও আছেন) শালবনীর বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী।.... বিমান বসুর এই মন্তব্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে যত চটুল ও উপেক্ষণীয়ই হোক, মমতার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য যাই-হোক পরিণামও যা-ই হোক, — একটা জিনিস কিন্তু সহজেই বোঝা যায়, ত্রিশ বছরের 'ভুলবাদীদের' মমতাকে কেন এতো ভয়।

ত্রিশ বছরের লাল শাসনে যারা বেপরোয়া ভোগ করেছে, বিরল পরিমাণে জনগণের জন্যে মলমূত্র ত্যাগ করেছে, গাড়ি-বাড়ি, বৌ কিনেছে, রাজনৈতিক দালাল ও দুর্বুদ্ধি বাজ বুদ্ধিজীবী কিনেছে, বন্ধে বন্ধে কলকারখানাকে বন্ধ করেছে, শিল্পের সর্বনাশ করেছে, বাংলাকে বন্ধ্যা করেছে, মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে, বোকা বানিয়েছে — সেকুলারিজিমের বেহেস্তে। বাংলায় তারা কেবল গুটি কয়েক বিজেপিকে বাগে আনতে পারে নাই, মমতা নামক মেয়েটার জনপ্রিয়তাটাকে স্পর্শও করতে পারে নাই। পরন্তু, শিল্পের নামে জমির প্রশ্নে মমতার আন্দোলনেই সরকার তার প্রক্রিয়াগত ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মমতার আন্দোলনেই সেই ভুলভুলাইয়া সরকার রাজ্যে এলোমেলো ভাবের বদলে ল্যাণ্ডম্যাপ তৈরির ঘোষণায় বাধ্য হয়েছে। মমতার নেতৃত্বে বিভিন্ন বিরোধী দলের আন্দোলনেই সেই শঠ সরকার, প্রতারক প্রশাসন এবং এক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারী শান্তিরক্ষক পুলিশের চরিত্র সম্পর্কে মানুষ সজাগ হয়ে গেছে। মমতার নেতৃত্বে বিরোধী আন্দোলন না হলে জমি-বিতর্ক উপস্থিতই হতো না, জমি অধিগ্রহণের স্থানগত ও প্রক্রিয়াগত ভুল সম্পর্কে সেই সরকার এবং তার প্রশাসন সতর্ক হতো না, জমি-লুণ্ঠন এবং তন্নিমিত্ত হত্যা-ধর্ষণ-খুনের কারবারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার বদলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলি মিটিয়ে নেবার কথা শোনা যেতো না, কৃষকের দাবি-বেদনা কান্না-দুঃখের কথা ভাষা পেতো না, দত্ত-মালিকদের মতো সুহৃদবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতো না, সর্বোপরি আজকের লালগড়-আন্দোলনের সমস্যা উপলব্ধির ক্ষেত্রে, পুলিশী বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক সতর্কতায় লালগড়ে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের সংযম যেটুকু এখন দেখা যাচ্ছে সেটুকুও দেখা যেতো না। মমতাদের যুক্ত আন্দোলনই প্রমাণ করেছে, টাটা-বাবারা মার্ক্সবাদকেও কিনে নিতে পারে, সনিয়ার ঘাটে লালুর ঘাটে জয়ললিতার ঘাটে এমনকী মায়াবতীর ঘাটেও শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়ানো বঙ্গীয় মার্ক্সবাদীরাও ভক্তিপ্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে পুঁজিপতি সেই সব টাটা-বিড়লাদের পুজো দিতে পারে, কিন্তু শত ভয়-ত্রাস, অর্থ-প্রতিষ্ঠা কোনও কিছু দিয়েই মানুষের আন্দোলনকে কেনা যায় না, ভাঙা যায় না।...

শ্যামল চক্রবর্তীরা বলেছেন, শিল্প সর্বনাশী মমতার নামে বাংলার মায়েরা নাকি তাদের সদ্যজাত কন্যার নাম 'মমতা' রাখবেন না — কিন্তু কৃষকেরা স্বপ্নের সবুজ ক্ষেত যারা লুট করে নিয়ে টাটা-সালিম-ফাউদের পায়ে সঁপে দিয়ে নিজেরা নিত্য নিবেদিত হচ্ছে, সেই সব শ্যামল চক্রবর্তীদের আপন আপন আত্মজারাও লজ্জায়-ঘৃণায় তাদের সদ্যভূমিষ্ঠ মেয়েদের নাম 'শ্যামল' রাখবে তো? অথবা, বিমান বসুরা যখন নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের জমির আন্দোলনের সাথে শালবনীর বিস্ফোরণকেও একই ডালের আলাদা আলাদা ফুল বলে ক্যারিকেচার করেন, তখন সিপিআই থেকে সিপিএম, সিপিএম থেকে সিপিএম (এল), সিপিআই (এম এল) থেকে সিপিআই (মাও) সংক্ষেপে মাওবাদীরাও সবাই আসলে একই পিতার আলাদা আলাদা মায়ের সন্তান কি না বলে যদি প্রশ্নে তোলে — তাহলে, কমিউনিস্ট পরিবার থেকে কী হবে তার উত্তর? .....

— না পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই না।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এ টি এস তদন্ত সত্য উদঘাটন না স্বার্থসিদ্ধি ?

প্রায় গত দুই দশক ধরিয়া ইসলামি সন্ত্রাসবাদ ভারতের সাধারণ নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাইতেছে। শুধু ভারতই বা বলি কেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশও ইসলামি সন্ত্রাসবাদের শিকার। ইতিমধ্যেই সত্তর হাজারের বেশি ভারতীয় এই সন্ত্রাসের বলি হইয়াছে। জৈস-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবার মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি এইসব সন্ত্রাসের দায় স্বীকারও করিয়া লইয়াছে। গত এক দশক ধরিয়া আরও কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এই দায় স্বীকার করিয়া লইয়া নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করিতে চাহিতেছে। ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন এবং সিমি এই গোষ্ঠীগুলির অন্যতম। ই-মেলের মাধ্যমে তাহারা জানাইয়াছে যে কোরাণের আয়াতের নির্দেশিত পথেই এই সন্ত্রাস। এমনকী ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের জেহাদ বা দাবির সমর্থনে কোরাণের আয়াতগুলি পুরোপুরি উদ্ধৃ ত করিয়া দিয়াছে।

ইউপিএ সরকার গঠিত হইবার পর কংগ্রেসের একটাই চিন্তা — নির্বাচন যখনই হউক না কেন ক্ষমতা পুনর্বার দখল করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস লইয়া কংগ্রস কখনও উদ্বিগ্ন হয় নাই। ইউপিএ-র অন্যান্য শরিক দল ও তাহাদের সমর্থকরাও কংগ্রেসের রাস্তাতেই হাঁটিতেছে। সন্ত্রাসকে তাহারা দেশবিরোধী কাজ বলিয়া মনে করে না। জেহাদীরা আল্লার ইচ্ছানুসারেই ভারতের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করিতেছে। সাধারণ মানুষ তাই আজ অসহায় ও সন্ত্রস্ত।

এই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায়, বিশেষত আমেরিকায় ৯/১১-র ঘটনার পর, বিশ্বের সব দেশই কার্যকর আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ভারতেও এন ডি এ সরকারের আমলে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় 'পোটা' আইন তৈরি করা হইয়াছিল। কিন্তু ইউপিএ সরকার এই আইনটির উপর সাম্প্রদায়িক রঙ লাগাইয়া বাতিল করিয়া দেয়। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইউপিএ সরকার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক বাজেট তৈরি, এমনকী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত সংসদ আক্রমণকারীর ফাঁসির আদেশ পর্যন্ত এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। এইসবই হইতেছে ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতি। আর ইহার ফলে সন্ত্রাসবাদ ও ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মতো ঘটনা বারবার ঘটিতেছে। পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে এইসব ঘটনার নেপথ্যে এখন এদেশে বসবাসকারীরাই রহিয়াছে।

নির্বাচন আসন্ন হওয়ায় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ কংগ্রেসকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। মুসলিম মৌলবাদীরা সন্ত্রাসকে জেহাদ বলিয়া গর্ব করিলেও ইহাকে ইসলামিক সন্ত্রাস আখ্যা দিতে রাজী নয়। কিন্তু তাহাদের এই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামি সন্ত্রাস কথাটি এখন সারা বিশ্বেই প্রচলিত। এই শব্দটিকে প্রতিহত করিতেই কংগ্রেসের এই হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্বের কৌশল আমদানি। যদিও হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলিয়া কোনও কিছুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, গত দুই মাসে এই কথাটি প্রায় আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রাজনৈতিক প্রচার ছাড়া বাস্তবে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের কোনও অস্তিত্ব নাই। এ কথা সত্য, জেহাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রচণ্ড ক্ষোভ রহিয়াছে, কিন্তু কোনও ভাবেই ইহাকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলা যাইবে না। অথচ কংগ্রেস ও তাহার শরিক দলগুলি ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে ইসলামিক সন্ত্রাস-এর মতো হিন্দু সন্ত্রাসবাদ কথাটি তুলিয়া ধরিতে চায়। যদিও এই বিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নাই, তবুও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে কমপক্ষে এইরূপ একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি কংগ্রেসের খুবই প্রয়োজন। সাধবী প্রজ্ঞা সিং এবং লেঃ কর্ণেল পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করিয়া কংগ্রেস সেই উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করিতে চায়। আর এই কারণেই সাধবী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে একটি প্রচারের ছক কষা হইয়াছে যাহা গল্প হইলেও সত্য বলিয়া মনে হয়। সাধবী ও লেঃ কর্ণেল পুরোহিতকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করা হইতেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নির্বাচিত অংশে বিষাক্ত মিথ্যার প্রলেপ দিয়া সত্য ঘটনা বলিয়া সংবাদ মাধ্যমের কাছে ফাঁস করিয়া দেওয়া হইতেছে।

নাসিক আদালতে সাধবী যখন এফিডেভিট পেশ করিলেন, তখন মিথ্যার বেলুনটি একেবারে চুপসাইয়া গিয়াছে। এই এফিডেভিট-এর সূত্রেই জানিতে পারা যাইল, এ টি এস অফিসাররা তাহাকে লাঠি ও বেল্ট দিয়া প্রহার করিয়াছে। তাহাকে অশ্লীল ছবি দেখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। পলিগ্র্যাফিক ও নার্কো টেস্টের পরও কোনও কিছুই তেমন পাওয়া যায় নাই। যোগগুরু রামদেবজী সহ দেশের বহু ধর্মগুরু সাধবীর উপর এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বিরোধী দলনেতা এল কে আদবানীও নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছেন। বস্তুত একজন নারীর উপর পুলিশের এই অত্যাচারে সমগ্র ভারতবাসীর মাথা লজ্জায় নত হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় হইল, গুজরাটের দাঙ্গায় যাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দিল্লীর বাটলা হাউস প্রতিরোধকে যাহারা সাজানো বলিয়া মনে করে, সংখ্যালঘুদের উপর তথাকথিত অত্যাচারে যাহারা বুক চাপড়াইতে অভ্যস্ত, সেইসব মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং এন জি ও-গুলি-র মুখে কোনও 'রা' নেই। বস্তুত সাধবীর এফিডেভিট প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় পুরো ছকটাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

কোণঠাসা এ টি এস এখন একটি নতুন তত্ত্ব আমদানি করিয়াছে। আর এস এস সরকার্যবাহ মোহন ভাগবত এবং সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর বরিষ্ঠ সদস্য ইন্দ্রেশ কুমারকে মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা হত্যা করিতে চাইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। কথা হইল, এক সপ্তাহ আগেও যাহাকে (ইন্দ্রেশজীকে) মনে করা হইত হিন্দু সন্ত্রাস ষড়যন্ত্রের তাত্ত্বিক নেতা, তিনিই এখন সেই হিন্দু সন্ত্রাসীদেরই টার্গেট! ইহাকে চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কী বলা যায়। সেই দিন বোধ হয় খুব দেরি নাই যখন বিভিন্ন তদন্তকারী এজেন্সীগুলির কিছু কর্তাব্যক্তির এবং তাহাদের রাজনৈতিক মনিবদের 'ব্রেন ম্যাপিং'-এর দাবি উঠিবে। গুজরাট দাঙ্গার তদন্তে লালুপ্রসাদের নিযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির মতো এ টি এস-ও ফার্স বা প্রহসনে পরিণত হইবে না তো?

ডলারের তুলনায় টাকার দাম সর্বকালীন নীচে নেমেছে
ইন্দিরা জমানায় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ধারাবাহিকতা আর কতদিন ?

এন সি দে

গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর, ২০০৮ ভারতের টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫০ টাকারও উপরে অর্থাৎ ডলারের তুলনায় টাকার দাম সর্বকালীন নীচে নেমে গেছে। গত মে'০৮ মাস থেকেই ভারতীয় মুদ্রার এই অবমূল্যায়ণ দ্রুত শুরু হয়েছে। জানুয়ারি'০৮ -এ ছিল ৩৯.৪২টাকা, মে'০৮-এ হয় ৪০ টাকা আর নভেম্বর'০৮-এ হল ৫০.০২টা. অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে টাকার দাম কমল ২৭ শতাংশ।

এ এক আশ্চর্য্যজনক বৈপরীত্য। ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে আমেরিকা, অথচ আমেরিকার ডলারের তুলনায় দাম কমছে কিনা ভারতের টাকার! এ রহস্যের কারণ লুকিয়ে রয়েছে কোথায়? কেউ কেউ বলছেন, বিদেশী বিনিয়োগ সংস্থাগুলো যথেচ্ছভাবে তাদের হাতে থাকা ভারতীয় স্টকগুলি বিক্রি করতে থাকায়, ডলারের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার ব্যাপকভাবে কমতে থাকাই এর কারণ। জুন '০৮ -এ বিদেশী মুদ্রা ছিল ৩০২ বিলিয়ন ডলার। অক্টোবরে তা নেমে দাঁড়ায় ২৪২ বিলিয়ন ডলারে। আবার কারও কারও মতে, কিছু কিছু ব্যাঙ্ক ফাটকা কেনা-বেচা করাতেও এইভাবে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিলারদের মতে, এইভাবে চললে টাকার বিনিময় মূল্য ৫২ টাকায় পৌঁছতে বেশি দিন লাগবে না। ব্যাঙ্ক মালিকরা আবার বলছেন, রপ্তানী আয় কমে যাওয়া এবং বাণিজ্য ঘাটতি গত সেপ্টেম্বরে ১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাওয়াতে, রপ্তানী ব্যাবসায়ীরা তাদের ডলার আয় দেশে নিয়ে আসছে না।

উপরোক্ত সব কারণগুলিই দৃশ্যত বাণিজ্যিক ও আর্থিক ফাটকাবাজি। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী কারসাজি। কংগ্রেস পার্টি যখনই দেশের ক্ষমতায় থাকে তখনই বারবার আমরা দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনগুলোর এই রমরমা। এবারেও খবরে প্রকাশ ঢত্তঠ'র অদৃশ্য কালো হাত ভারতের এই বর্তমান আর্থিক-বাণিজ্যিক সংকটের পিছনে কাজ করেছে। গত ১১ই নভেম্বর '০৮ প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল-এর সদস্য সতীশ চন্দ্র ঝা প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে বর্তমান সঙ্কটে IMF'-র ভূমিকাকে অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং বেদনাজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এশিয়া সম্পর্কে IMF-র ভূমিকা সব সময়ই ভৌগোলিক বিদ্বেষমূলক। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০টি ধনী দেশের সম্মেলনের মাত্র দু-সপ্তাহ আগে আমাদের অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংজীকে অর্থনীতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রাক্তন ঢত্তঠ চিফ ইকনমিস্ট রঘুরাম রাজনকে প্রধানমন্ত্রীর অনারারি ইকনমিক অ্যাডভাইসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রীঝা'র মতো Economic Advisory council-র আরও অনেক পদাধিকারীরাও বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ঢত্তঠ পূর্ণ-উদ্যমে নির্বিঘ্নে তাদের কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছে। বাম ও বিজেপি নেতৃত্ব কী ১৯৬৬ সালের সেই ভয়াবহ ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ণের (Devaluation)'র পিছনে ঢত্তঠ-র ভূমিকার কথা জানেন না? ১৯৯৭'র এশিয়ার ভয়াবহ আর্থিক সংকটের পিছনে IMF-র ভূমিকার কথা জানেন না? তাহলে তারা IMF-র দালাল শ্রীরাজনের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের বিরোধিতা করছেন না কেন?

ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কটের ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যারা চর্চা করেন তারা জানেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই একক ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টি সরকার কখনই দেশের অর্থনীতিকে স্বাধীনভাবে চালনা করেনি। কখনও আমেরিকা বা কখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদারি করেছে। আর এটা করেছে ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল নেহেরু পরিবার। এই নেহেরু পরিবারের মুখোশ খুলে না দিলে, বি জে পি'র পক্ষে ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে, তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে এবং দালাল সংবাদপত্র সহ সমস্ত প্রচার মাধ্যমের আনুকূল্যে ইন্দিরা গান্ধীকে "এশিয়ার মুক্তিসূর্য" বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা এখন ১৯৬৬ সালে ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় মূল্য ৫৮ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার কাজে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তার আগে ১৯০৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত সময়কালের ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় মূল্যের তালিকাটুকু একবার দেখে নেওয়া যাক।

সারণী

বছর	বিনিময় মূল্য
১৯৫০-৫১	৪.৭৬
১৯৬০-৬১	৪.৭৬
১৯৬৬-৬৭	৭.৫০
১৯৭০-৭১	৭.৫০
১৯৮০-৮১	৭.৯১
১৯৯০-৯১	১৭.৯৪
১৯৯১-৯২	২৪.৪৭
১৯৯২-৯৩	৩০.৬৫
১৯৯৩-৯৪	৩১.৩৭
১৯৯৪-৯৫	৩১.৪০
১৯৯৫-৯৬	৩৩.৪৫
১৯৯৬-৯৭	৩৫.৫০
১৯৯৭-৯৮	৩৭.১৬
১৯৯৮-৯৯	৪২.০৭
১৯৯৯-০০	৪৩.৩৩
২০০০-০১	৪৫.৬৯

(সারণী দ্রষ্টব্য)

১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত টাকার বিনিময় মূল্য স্থিতিশীলই ছিল। অর্থাৎ তখনও ভারত সরকারে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল আমেরিকার খোলাখুলি তাঁবেদারি শুরু করেনি। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ক্ষমতাসীন প্রিয়দর্শিনী প্রধানমন্ত্রী তাঁর মোহ বিস্তার করে সকলের মুখ বন্ধ করে আমেরিকার অধীনস্থ IMF'র সঙ্গে যোগসাজসে টাকার বিনিময় মূল্যের ৫৮ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটালেন। আর সেই হল টাকার অবমূল্যায়নের ধারাবাহিক যাত্রা শুরু। আজকের মতো সেদিনেরও ষড়যন্ত্র হয়েছিল পর্দার পিছনে। নায়ক ছিল এই ঢত্তঠ।

আসুন একটু ইতিহাসের পাতা ঘাঁটি। যেখানেই অভাব, অনটন, সঙ্কট সেখানেই IMF তার বাঘবন্দী করার খাঁচা নিয়ে হাজির হয়ে থাকে। খাঁচার মধ্যে ছাগল রেখে দিয়ে যেমন বাঘকে টোপ দিয়ে বন্দী করে, ঠিক তেমনি ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তার পরের দু'বছরের তীব্র খরার পরিপ্রেক্ষিতে ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের মুহূর্তে IMF হাজির হয়েছিল তার খাঁচা নিয়ে। বিপুল আর্থিক সহায়তার টোপ দিয়ে ব্রেটনউড চুক্তিতে পূর্ব শর্ত হিসেবে টাকার অবমূল্যায়নের চুক্তিতে রাজি করিয়ে নেয় ইন্দিরা গান্ধীকে। ডঃ তারলোক সিং ছিলেন সেই সময় পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান। তিনি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর ধরে এই পদে ছিলেন। শ্রীসিং IMF'র কথায় বিশ্বাস করে এই অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে এই পদ ত্যাগ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী কোনও কথা শোনেননি। তিনি শ্রী অশোক মেহতাকে দিয়ে এই অবমূল্যায়নের প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। ৫৮ শতাংশ মুদ্রার মূল্য হ্রাসের অর্থ হল আগের ঋণও ৫৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়া। পরের ঋণের পরিমাণও ৫৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়া আর আমদানি খরচও ৫৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়া, মূদ্রা মূল্য হ্রাসের এ এক Recurring Effect — এই প্রভাবের কুফল ভারতীয় অর্থনীতিকে আজও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আজকের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ১৯৯১ সালে অর্থমন্ত্রী হয়েই দেশকে বেঁধে ফেলেছিলেন এক নয়া অর্থনীতির জালে, যে জালের সুতোটি ছিল আমেরিকার হাতে। সেই অর্থনীতি ছিল এমনই মারাত্মক যার কুপ্রভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হয়েছিল ৮০ সালের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি (৭.৯১ থেকে ২৪.৪৭)। এবারের অবনমনের পিছনেও সেই কংগ্রেসী নেতৃত্বের আনুকূল্যে IMF'র কালো হাত প্রমাণিত।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৬ থেকে মুদ্রার মূল্যহ্রাস কখনও বন্ধ হয়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রীত্বে NDA সরকারের আমল। ২০০০ সালে মূল্য ছিল যেখানে ৪৫.৬৯ টাকা, সেখানে অচিরেই এই মূল্য বাড়তে শুরু করেছিল। ২০০৮ এর ১ জানুয়ারিতেও ছিল ৩৯ টাকা ৪২ পয়সা। যে NDA সরকার বিদেশী বাণিজ্য বাড়িয়ে বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডারের ঐতিহাসিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, মুদ্রার বিনিময় মূল্য ধীরে ধীরে বাড়িয়েছিল, সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যূত করে ঢত্তঠ'র দালাল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে বামপন্থী দলগুলো কী রাষ্ট্রহিতের পরিচয় দিয়েছিল? মুদ্রার মূল্যহ্রাসের এই কংগ্রেসী ধারাবাহিকতা আর কতদিন চলবে?

সূত্র : ডঃ তারলোক সিং-এর "Indians Development Expirience" এবং শ্রীদয়াকৃষ্ণ'র "Golden Age to Globolisations".

এই সময়

গান ভালো

গান ভক্তদের সুখবর শোনালেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি ম্যারিল্যাণ্ড মেডিকেল সেন্টার-এর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গান মানুষের হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখে। তাঁদের মতে, গানের ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে — ঠিক যেমনটি ব্যায়াম বা শরীর চর্চার সময় হয়ে থাকে। তাই বলে শরীর চর্চা বন্ধ করে, শুধু গান শোনারই পরামর্শ দেননি তাঁরা। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনও পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে সমস্ত ব্যক্তি যখন তাদের প্রিয় গান শুনছেন তখন তাঁদের রক্ত সঞ্চালনও স্বাভাবিক থাকছে।

জিলিপি-র রেকর্ড

জিলিপি-র স্বাদ শুধু মিষ্টি নয়, জিলিপি যে রাজ্যের মর্যাদা বাড়াতে পারে একথা জানা ছিল না মেঘালয়বাসীদের। পনেরো কেজি ওজনের জিলিপি তৈরি করে, রীতিমতো গিনিস বুকে রেকর্ড গড়ল মেঘালয়। পঁচাত্তর ইঞ্চি ব্যাসের এই জিলিপি কুড়ি জন মিলে তৈরি করেন। মেঘালয়ের পর্যটন মন্ত্রী কনরদ কে সাংমাও জিলিপির রেকর্ড তৈরিতে আনন্দিত। জিলিপিটি তৈরি করতে তিন কেজি ময়দা, ছ' কেজি ঘি ও আশি কেজি সিরাপ লেগেছে।

নারকোলেপ্সি

অফিসের চেয়ারে বসে দিবানিদ্রার ব্যাপারটা আপনি যে চোখেই দেখুন না কেন, বিশেষজ্ঞরা এই অভ্যাসকে কিন্তু এক ধরনের রোগ বলেই মনে করছেন। জাপানের বিজ্ঞানীরা এই রোগের পিছনে 'নারকোলেপ্সি' নামক এক ধরনের জিনকে দায়ী করেছেন। জাপানে এই রোগীর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত বেশি। নারকোলেপ্সি-র ফলে, শরীরের পেশিগুলো দুর্বল ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে বলেও চিকিৎসকদের অভিমত। জিনগত এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়টা বিশেষজ্ঞদের কাছে এখনও পরিস্কার নয়। তবে যারা দিবানিদ্রার ভক্ত তারা অবশ্য এই তথ্যে অনেকটাই বিচলিত।

বনাঞ্চল বৃদ্ধি

আবহাওয়ার তারতম্য ও গ্লোবালাইজেশনের কারণে, আবহাওয়াবিদেরা যখন রীতিমতো উদ্বিগ্ন তখনই দেশবাসীকে সুখবর শোনাল বন ও পরিবেশ দপ্তর। ২০০৮ সালে এ দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট বনাঞ্চল ৭.৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে সিকিমে ৮২.৩১ শতাংশ আন্দামান ও নিকোবার ৮৬.৯৩ শতাংশ, মিজোরাম ও মণিপুরে ৭৮ শতাংশ বনাঞ্চল। বন হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে ২০০৮ সালটা আশার আলো দেখিয়েছে পরিবেশবিদদের।

হৃদ বিপদ

ভারতীয় মহিলাদের হৃদরোগের পরিসংখ্যানটা পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। মহিলাদের কাছে এটি দুঃসংবাদ শোনালেও, সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতীয় মহিলারা পুরুষদের চাইতে হৃদরোগে বেশি ভোগেন। গুরগাঁওয়ের আর্তেমিস হেলথ ইনস্টিটিউটের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে এর কারণ হিসাবে খতিয়ে দেখা গেছে মহিলাদের ধূমপান ও বেশি পরিশ্রমের ফলেই হৃদরোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোণ ঠাসা

এদেশে পর পর বিস্ফোরণে মুসলিম দুস্কৃতীদেরই যোগসাজেস ধরা পড়ায় মুসলিম মৌলবীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এখন পিঠ বাঁচাতে তারা মাঠে নেমেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি সম্মেলনেই মৌলবীরা মুসলিম মানেই সন্ত্রাসবাদী নয় এই প্রচার চালাচ্ছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের আলোচনায় এই বিষয়টিই বেশি প্রাধান্য পায়। প্রায় ৬,০০০ মুসলিম ছাত্র, মৌলবী ও নেতারা তাদের বক্তব্যে মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী নয়, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। যদিও বাস্তব চিত্রটা পুরোটাই বিপরীত।

বন্দী নারী

এদেশে এখনও বহু নিরুপমাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কর্ণাটকের চিত্রটা এক্ষেত্রে রীতিমতো উদ্বেগজনক। সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের রিপোর্টে দেখা গেছে, কর্ণাটকের প্রায় পাঁচজন মহিলার এক জন কোনও না কোনও কারণে স্বামীর হাতে মার খেয়েছেন। আরও আশ্চর্যের যে, এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আছেন, যারা স্বামীর অত্যাচারে আইনি ব্যবস্থার পথে হেঁটেছেন। মধ্য যুগের নারী নির্যাতনের চিত্রটা থার্ড জেনারেশনের যুগেও একই রয়ে গেছে।

উজ্জ্বল পাঞ্জাবী

পাঞ্জাবীরা বিদেশেও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে কসুর করেনি। কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও ফিনল্যাণ্ড — এই তিন দেশেরই আইন পরিষদে লড়াকু পাঞ্জাবীরা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। কানাডা থেকেই এই জয়যাত্রার শুরু। কানাডায় ৯ জন পাঞ্জাবী হাউস অফ কমনস-এ নির্বাচিত হয়েছেন। প্রবাসী পাঞ্জাবীদের এই কীর্তিতে ভারতীয় পাঞ্জাবীরাও রীতিমতো গর্বিত। এখন তিন দেশেই আইন পরিষদে তাঁরা স্বাভিমানের সঙ্গে কাজ করছেন।

জনজাতিদের এই বিদ্রোহ কেন ?

(১ পাতার পর)

অভিযোগ, আর অভিযোগের লক্ষ্য পার্টি কর্তা থেকে প্রসাশনিক কর্তা সবাই। অনেকদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আজ ফেটে পড়েছে। প্রতিবাদ করলেই জুটেছে মাওবাদী তকমা ও পুলিশের অত্যাচার। বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত লালগড়ের এই বিদ্রোহ তাই অহেতুক নয়। মাওবাদী আন্দোলন বলে প্রচার করলেও এই সমস্যার সমাধান উন্নয়ণের মাধ্যমেই করতে হবে।

যদিও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২০০৬-০৭ বার্ধক্যভাতা খাতে খরচ দেখানো হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম ৬২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এরপরও গত ২৯ ডিসেম্বর বিনপুর ২ নং ব্লকের বেলপাহাড়িতে 'ভড়রা' গ্রামে অনাহারে মারা গেছেন ৭৭ বছরের গরিব আদিবাসী শবর। ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বলছে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রতি হাজারে ১০৬ জন বছরের বেশ কয়েক মাস এবং ১৩ জন সারা বছরই অর্ধাহারে কাটাচ্ছেন। টাকা বরাদ্দ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬-০৭ সালে অর্ধেক টাকা খরচ করতে পারেনি। অথচ আশ্চর্যের কথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী ওই জেলারই প্রতিনিধি।

সেচের সামান্য সুযোগ বিহীন 'ভড়রা' গ্রামের গ্রামের গরীব চাষি খেত মজুরেরা। বর্ষায় খেতের কাজ করলেও শুখা মরসুমে শালপাতা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একটা শালপাতার গুদাম চেয়েছিল গ্রামবাসীরা। সাঁদাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এটি বানাতে নাকি ১ লক্ষ ৮০ হাজার খরচ করেছে কিন্তু গুদাম হয়নি।

সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া 'মকোকা'

(১ পাতার পর)

সঙ্গে দীর্ঘ বন্দুকের লড়াইয়ের পর গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ MCOCA-র পরিবর্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি এক্সপ্লোসিভস্ সাবস্ট্যানসেস অ্যাক্ট এবং আনলফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনসন অ্যাক্ট ধারায় অভিযোগ এনেছে। এই দুটি আইনে কোনও ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ তিন মাসের বেশি আটক রাখা যায় না। অথচ দিল্লীতে ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে আছে। কিন্তু মালেগাঁও কাণ্ডের ১০ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ মুম্বাই এ টি এস পায়নি। যা হাতে আছে তা হলো অভিযুক্তদের কয়েকজনের স্বীকারোক্তি। এই তথ্যটি গত ২০ নভেম্বর মুম্বাইতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মুম্বাই এ টি এস প্রধান হেমন্ত কারকারে নিজেই জানিয়েছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মিডিয়াকে একহাত নিয়ে বলেছেন যেভাবে সাংবাদিকরা প্রতিদিন নানারকম গালগল্প লিখছেন তাতে তদন্তকারি গোয়েন্দারা চাপে পড়ে যাচ্ছেন।

সাধবী প্রজ্ঞা এবং লেঃ কর্ণেল পুরোহিতের "স্বীকারোক্তি" বলে মুম্বাই এ টি এস যে দাবি করেছে তা আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। তা ছাড়া তাঁরা আদালতে হলফনামা দাখিল করে অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ হেফাজতে তাঁদের উপর অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাঁদের উপর একাধিকবার নারকোটিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই পরীক্ষায় বিশেষ রাসায়নিক বিষের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। যা ব্যক্তির স্নায়ু অবশ করে দেয়। মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি লুপ্ত করে। এই পরীক্ষা অতি বিপজ্জনক। কারণ, এই রাসায়নিকের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ব্যক্তির স্নায়ু ও মস্তিষ্ক পাকাপাকিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নারকো টেস্টের আগে আদালত এবং ব্যক্তির আগাম সম্মতি নিতে হয়। এই বিপজ্জনক রাসায়নিক পরীক্ষা সাধবী প্রজ্ঞার উপর দু'দুবার করা হয়েছে। যা আজ পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তের উপর করা হয়নি। এমনকী কুখ্যাত মাফিয়া আবু সালেমের উপরও নয়। সালেমের উপর একবারই করা হয়। চলতি বছরে জয়পুর, বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদ, দিল্লীতে হওয়া বিস্ফোরণে যে সব জেহাদিদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একজনেরও নারকো টেস্ট করা হয়নি। কেন? সংসদ ভবনে হামলা চালানোর ঘটনার মূল পাণ্ডা আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ দিল্লী হাইকোর্ট এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখার পরেও আজও তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়নি। কেন? সহজ উত্তর, মুসলিম সমাজের মন পেতে কংগ্রেস প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও অগ্রাহ্য করবে।

কংগ্রেসের এই ষড়যন্ত্রে পুলিশের সঙ্গে শরিক হয়েছে মিডিয়া। প্রতিদিন সেখানে লেখা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হিন্দু সন্ত্রাসবাদী। স্বামী দয়ানন্দ পাণ্ডে একজন ভণ্ড প্রতারক। লেঃ কর্ণেল পুরোহিত গুপ্ত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন "অভিনব ভারত" এর অন্যতম পরিচালক। ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নাসিকের প্রখ্যাত সামরিক শিক্ষা সংস্থা ভোঁসলা মিলিটারি আকাদেমি আদতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র ইত্যাদি। মিডিয়ার এই লাগাতার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জনস্বার্থমূলক আবেদন মুম্বাই হাইকোর্টে দাখিল হয়েছে।

একবিংশ শতকে সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়া বিদেশি শিক্ষা ও ভাবধারায় লালিত পালিত সাংবাদিকরা খবরই রাখেন না যে শতবর্ষ আগে স্বাধীনতার যুদ্ধের অক্লান্ত (বীর) সৈনিক দামোদর বিনায়ক সাভারকার এই "অভিনব ভারত" সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংগঠনের মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম্। যে সংগঠনের লক্ষ্য ছিল বৃটিশ রাজশক্তিকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা। ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বীর সাভারকার অভিনব ভারত সংগঠনের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। এরপর গত পাঁচ-সাত বছরে ভারতের বুকে ইসলামি জেহাদিদের একতরফা হামলার ঘটনায় বিচলিত হয়ে পুনায় গোপাল গডসের কন্যা হিমানী সাভারকার ২০০৬ সালে "অভিনব ভারত" সংগঠনকে পুনর্জীবিত করে হিন্দু জাগরণের কর্মসূচী শুরু করেন। মিডিয়া প্রচার করছে যে অভিনব ভারতের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ আসলে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ দীক্ষার আখড়া।

এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে হিমানী সাভারকার মুম্বাই হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন।

রাজ্য রাজনীতি

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব-কে সামনে রাখলে সিপিএমের ভরাডুবি

নিশাকর সোম

সম্প্রতি একটি বেসরকারি চ্যানেলে দেখা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অধ্যাপকদের সংগঠনের সম্মেলনে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তেড়ে ফুঁড়ে এরাজ্যে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে বলেছেন। ঠিক সেই সময়ে জঙ্গলমহলে জনজাতি এবং সাঁওতাল জনসমাজ অস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহী মিছিল করছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের জনজাতি সাঁওতাল হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠল কেন? সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসুর মতে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা মাওবাদীরা এই হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। সিপিএম নেতারা আরও বলছেন, শিবু সোরেন-এর সঙ্গে মনমোহন-সোনিয়ার চুক্তি মতো নাকি শ্রীসোরেন মেদিনীপুরের দু'টি জেলা, পুরুলিয়া ঝাড়খণ্ডে আন্‌তে চান। তিনি নাকি মাওবাদীদের অঞ্চল থেকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে তাঁদের ফ্রি-হ্যাণ্ড দিয়েছেন। স্মরণ করা দরকার, সিপিএম মাওবাদীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কথা বলেছিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মাওবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার করার মতো রাজনৈতিক জ্ঞান সিপিএম-এর জেলা কমিটি পর্যন্ত কতজন সদস্যের আছে সেটা একটা প্রশ্ন। কারণ নির্বাচন জেতাই এখন তাদের একমাত্র কাজ। আর তা করতে গেলে পেশী সঞ্চালন করাটাই একমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তাই পলিটিক্যাল পারসুয়েশান-এর জায়গায় ফিজিক্যাল ম্যাসল পারসুয়েশান করা হয়।

এখানে একটু পুরানো কথা বলতে হয়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি একদা এই জঙ্গলমহলে যথেষ্ট সাংগঠনিক কাজ করেছিল — এ কথা আমাকে মেদিনীপুরের প্রয়াত নেতা দেবেন দাশ বলেছিলেন। তিনি এই জঙ্গলমহলে মিশে গিয়ে ধামসা-মাদল বাজাতেন-নাচতেন। এক কথায় এদের সমাজের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিলেন। সে-রাম নেই সে-অযোধ্যাও নেই। এখন সিপিএম তো ধনিকশ্রেণীর পার্টি। পার্টি তো কর্পোরেট হাউসের কায়দায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা লগ্নী করে রীতিমতো বাড়িয়ে তুলেছে।

সিপিএম সরকার কি হিসাব দিতে পারে এই অঞ্চলের সাঁওতাল জনসমষ্টির জন্য কি করা হয়েছে। জনজাতিদের শিল্প-সংস্কৃতির বত্রিশ বছরের শাসনে কতটুকু উন্নতি করা হয়েছে? এঁদের খাদ্য-বস্ত্র-পানীয় জল-বাসস্থান-এর উন্নতি করা হয়নি কেন? কেন এঁদের কুটির শিল্প এবং আঞ্চলিক শিল্পকে গড়ে তোলা হল না? যাঁরে তুমি পিছে রাখ সে তোমারে টানিবে পশ্চাতে। কবির একথাটা যে কত সত্য তা দেখা যাচ্ছে।

সিপিএম নেতৃত্ব আজ কর্পোরেট হাউসের এম ডি-দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। নিচের তলার কর্মীরা প্রমোটারদের হাতের পুতুল বলে ফ্ল্যাট-বাড়ি-গাড়ি বিত্ত করে তুলেছে। সল্টলেক তো নেতার হাটে পরিণত হয়েছে। নেতাদের মধ্যে সাঁইবাড়ি কুখ্যাত বিনয় কোঙার নিম্নস্তরের কথাবার্তা বলেন। আমাকে হাওড়ার বহিষ্কৃত এক নেতা বলেছিলেন, জনৈক চক্রবর্তীর সঙ্গে বিনয় কোঙার ব্যবসা করেছিলেন এবং সেই চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নৈতিক অধঃপতনের অভিযোগ এনে বহিষ্কার করা হয়, কারণ নাকি বিনয় কোঙার। এটা কি সত্য? পূর্ববঙ্গে একটা কথা চালুছিল — সব গেলো মইর‍্যা-কত্তা হৈল হইর‍্যা, অর্থাৎ সব গেল মরে কত্তা হল হরে।

আর একজন নেতা-মন্ত্রী গৌতম দেব — তিনি মাঝে মধ্যে সারগর্ভ নিবন্ধ লেখেন। কিন্তু তিনি ভাড়ার আবাসন বাড়ানোর চাইতে প্রমোটারদের সঙ্গে যৌথ আবাসন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিরোধী নেতারা চুপ থাকেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে গৌতমবাবুর 'র‍্যাপো'' ভালো।

সিপিএম সরকার কি হিসাব দিতে পারে এই অঞ্চলের সাঁওতাল জনসমষ্টির জন্য কি করা হয়েছে। জনজাতিদের শিল্প-সংস্কৃতির বত্রিশ বছরের শাসনে কতটুকু উন্নতি করা হয়েছে? এঁদের খাদ্য-বস্ত্র-পানীয়, জল-বাসস্থান-এর উন্নতি করা হয়নি কেন? কেন এঁদের কুটির শিল্প এবং আঞ্চলিক শিল্পকে গড়ে তোলা হল না? 'যাঁরে তুমি পিছে রাখ সে তোমারে টানিবে পশ্চাতে'—কবির এ কথাটা যে কত সত্য তা দেখা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর, জঙ্গলমহল-লালগড় কেন হল? কারণ একটাই — ৩২ বছরের অবহেলা-আর নির্বাচনের সময়ে অর্থ-পানীয় দিয়ে মত্ত করে ভোট দেওয়ানো? মত্ততার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে এঁরা প্রতিবাদী হচ্ছেন।

শুধু এঁরা নন, সরকারি কর্মচারী-পুলিশ বুদ্ধবাবুর সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন কেন? কারণ ঔদ্ধত্য অবহেলা তাচ্ছিল্য। বুদ্ধবাবু পেটোয়া সরকারি কর্মচারি পুলিশ নিয়ে এক চক্র গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

সিপিএম শুধু যে কৃষক-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাই নয়। শ্রমিকদের কাছ থেকেও দূরে সরে গেছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল — সিটু-এর কলকাতা জেলার সম্মেলন শ্রমিক অধ্যুষিত খিদিরপুর-বেহালা অঞ্চলে হচ্ছেনা। এখন সিপিএম-এর শ্রমিক নেতারা পোর্ট-ডক-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রশাসনিক কাজে লিপ্ত আছেন। খিদিরপুরে তো কারখানা বন্ধের হিড়িক চলছে।

সিপিএম ছাত্রদের থেকেও সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কার্যত এস এফ আই বিতাড়িত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তো জঙ্গলমহলের ''মাওবাদীদের'' সমর্থনে মশাল মিছিল করেছে।

সিপিএম সরকার যুবকদের চাকরি না দিতে পেরে কম্পিউটার কেন্দ্র-এর বহুল প্রসার করে যুবক-যুবতীর সামনে চাকরির নামে খুড়োর কল খুলেছে। এই যুবকরা একদিন বিদ্রোহ করবে এবং বিরুদ্ধে ভোট দেবে। সেটা হাওড়া পুরসভা নির্বাচনেই দেখা যাবে। বস্তুত সিপিএম নেতা কর্মীদের ঔদ্ধত্য এবং ভ্রান্ত নীতির ফলে সিপিএম জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই এখনই সিপিএম-কে নির্বাচনে পরাজিত করা সহজ যদি ১:১ প্রার্থী দেওয়া হয়।

আরও ঘটনা হল, মুখ্যমন্ত্রী-পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব-কে সামনে রাখলে আগামী বিধানসভায় সিপিএম-এর ভরাডুবি হবেই।

অন্যরকম

বাইক ম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কবির কথায়, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ রে ভাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। একদিন কবির এই কথা মতোই এক আত্মীয়র গুদামঘর থেকে ছাই উড়িয়ে, রাজস্থানবাসী বিজু সিং সন্ধান পেয়েছিলেন আসল রতনের। মান্ধাতা আমলের সেই ছোটো বাইকটি চুনির মতো তার ভাগ্যে নাম, যশ বয়ে নিয়ে এসেছে। একদিন ৫০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া বাইকটি যে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। এই বাইক তো শুধু বিজুবাবুকেই ঘোরায়নি, সেই সঙ্গে তাঁর ভাগ্যকেও ঘুরিয়েছে সমান তালে।

বাইক কাঁধে বিজু সিং।

বৃটিশ আমলের ছোটো মোটর বাইকটির সর্বসাকুল্যে ওজন মাত্র ৩৫ কেজি। আট ইঞ্চির দুটি চাকার ওপর ভর করে যখন বিজুবাবু ঘুরে বেড়ান, তখন পাড়ার লোক বিজুবাবুকে 'বাইক ম্যান' বলে ডাকা-ডাকি করে। একসময় বৃটিশ আর্মিরা এই ছোট বাইকগুলি ব্যবহার করতেন। একে সাধারণত প্যারাসুট বাইক বলা হত। আজ বাইক ম্যান হিসাবে তিনি যখন বাইক চালান, তখন মনে মনে গর্ব অনুভব করেন।

৩৫ কেজির ছোটো বাইকটিকে বিজুবাবু যেন নিজ সন্তানের মতো, স্নেহ-মমতায় আপন করে তুলেছেন। দুটি চাকা পাল্টে বাইকটির প্রথম মেরামতকরেন তিনি। মটর-বাইকটি চালিয়ে বিজুবাবু তাঁর প্রাক্তন আই এস পুলিশ বন্ধুর বিচার বিভাগীয় কাজে সহায়তা করেছেন। আবার যেখানে বাইক তার ক্ষমতা হারিয়েছে, সেখানে বাচ্চা ছেলের মতোই বাইককে কাঁধে বয়ে নিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে এ যেন পিতা-পুত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

একদিন এই বাইকে ভরসা করেই, ভিনটেজ র‍্যালিতে ফার্স্ট হয়েছিলেন বিজুবাবু। পুরস্কার জিতেছিলেন ভুরি ভুরি। আর সেই থেকেই একাদশে বৃহস্পতির অবস্থান। পর পর বহু গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। শুধু কি গাড়ি প্রতিযোগিতা। গাড়ির নেশায় নিজের বাড়ির নিচের তলাটাকেই একটা ছোট-খাটো গ্যারেজ বানিয়ে ফেলেছেন তিনি। ভগ্নীপতির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে, আজ তিনি নিজেই বাইক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছেন।

তবে তাই বলে বিজবাবু তাঁর ছায়া সঙ্গী মান্ধাতা আমলের বাইকটিকে বিক্রি করে দেননি। আবার তাকে ছাই-কুটোর মতো ফেলেও দেননি। একদিন এই রতনই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল। পুরনো চাল ভাতে বাড়ার গুণটা বিজু সিং এখন প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেন। স্কুলে গোল্লা খাওয়া বিজু সিং আজ গ্যারেজের বস। বিজুবাবু বাইক ম্যান হিসাবেই প্রতিবেশীদের কাছে বেশি আপন। ছাই থেকে রতন পেয়ে বিজু সিং-এর লাইফ স্টাইলটাই যেন বদলে গেছে। আজও বড় গাড়ির দৌড়ে যান। ৭৫ বছরের বাইকম্যানটি মাঠে নামলে তাবড় তাবড় চ্যাম্পিয়ানরাও ঘাবড়ে যান। বিজুবাবু বার্ধক্যের চাপে চাপা পড়ে যাননি, আজ থার্ড জেনারেশনের যুগেও তিনি মান্ধাতা আমলের বাইক নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ান। বাইক ম্যান উপাধিটা যেন তাঁর জন্যই বরাদ্দ ছিল।

হাসিনা-খালেদা বৈঠক খুবই জরুরি

বিশেষ সংবাদদাতা ।। নির্বাচন, সাংগঠনিক কাঠামো, নেতাদের পদায়ন ও বহিষ্কার নিয়ে, বিএনপি-তে চলছে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। ধারণা করা হয়েছিল দলীয় চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া কারামুক্ত হওয়ার পর, এসব সমস্যা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। বাস্তবে তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বি এন পি-র মহাসচিব একদিকে, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টারা অন্যদিকে। তারেক রহমানের পদত্যাগের পর তার অনুগামী তরুণ কর্মীরা হতাশ। সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা বিভ্রান্ত। জেলায় জেলায় যে কোন্দল তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও সংক্রমিত করছে। সদর দপ্তরে যুগ্ম মহাসচিবের কক্ষে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন মহাসচিব। মহাসচিবের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেন যুগ্ম মহাসচিব।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিএনপি-র প্রথম (এবং সম্ভবতঃ শেষও) বৈঠকটি মধুরেন সমাপন হয়নি। ভদ্রলোকের এক কথা বলে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার সি ই সি ডঃ শামসুল হুদার কাছে কতগুলো দাবি পেশ করে আসছেন। তার সাফ কথা জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ বাতিল করে পুরনো আইনেই নির্বাচন করতে হবে। এর দু'দিন পর দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক আমলা এম কে আনোয়ার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের কতিপয় ধারা শিথিল করার অনুরোধ জানালেন। বৈঠক শেষে তিনি এও বললেন, কমিশনের সঙ্গে তাদের বৈঠক সফল হয়েছে। নিবন্ধন করেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে। দুপুরে এই বয়ান দেবার পরই সন্ধ্যায় মহাসচিবের কাছ থেকে ফরমান এল নির্বাচন বা অন্য কোনও নীতি নির্ধারণকারী বিষয়ে তারই কথা বলার এক্তিয়ার আছে। বাধ্য হয়ে এম কে আনোয়ার তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর যুক্তি ছিল, এত কম সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে কাউন্সিল করে দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে না। পরে নির্বাচন কমিশন আগামী ছয় মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধন সাপেক্ষে দলনিবন্ধন করার বিধান জারি করে। এত সব ছাড় দেওয়ার পরও বিএনপি মহাসচিব কেন জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য চাপ দিচ্ছে, আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছে সে প্রশ্নের জবাব কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনে বিএনপির নিবন্ধিত হতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সামরিক আইন বলে রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় দলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছিলেন। অর্থাৎ তখন রাজনীতি করতে হলেই সরকারের অনুমতি নিতে হত। ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির আওতায়ই ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক সহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ব্রাকেট বন্দী করা হয়েছিল। এর আগে ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলো স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হত, যদিও প্রত্যেকটি সংগঠনই মাদার পার্টি হিসেবে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করত। বিএনপি তথা চার দলের নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার বিষয়টি শিগ্গিরই ফয়সালা হয়ে যাবে। সি ই সি বলেছেন, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে। সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া একটি ইংরেজি ও দুটি বাংলা দৈনিককে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এসব সাক্ষাৎকার সম্পর্কে স্বভাবতই মানুষের কৌতূহল রয়েছে। এক বছরেরও বেশী সময় কারারুদ্ধ থাকার পর, সম্প্রতি আদালতের রায়ে তিনি মুক্ত হয়েছেন। শারীরিকভাবে তিনি অনেকটা অসুস্থ, তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'দ্বিতীয় হাওয়া ভবনে' দল ও জোটের রুটিন বৈঠক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও সমাবেশে যোগ দেননি। মাঝখানে একদিন খণ্ডিত সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজিত ইফতার পার্টি ও জিয়ার মাজারে ফাতেহা পাঠে অংশ নেন। ইংরেজী দৈনিক New Age ও বাংলা দৈনিক নয়া দিগন্ত এবং আমার দেশে প্রকাশিত তিনটি সাক্ষাৎকারের সারমর্ম প্রায়

হাসিনা

খালেদা

এক। কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অকপটে, আবার কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। পুরো সাক্ষাৎকারে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তবে এই সাক্ষাৎকার বিএনপি চেয়ারপার্সন ১/১১ এর পরিবর্তনের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। গ্রেপ্তারের আগে অসংখ্য টেলি-কনফারেন্সে এবং বন্দী অবস্থায় আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে তিনি যেভাবে ১/১১ এর পরিবর্তনকে ষড়যন্ত্র কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা, চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবারে সেটি করেননি। বরং শেখ হাসিনার ন্যায় খালেদা জিয়াও সরকারের কার্যক্রমের আগাম বৈধতা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, The interim governmental set its own course, tenure, Jurisdiction and agenda, it some irregularity has occurred during this government's rule, we may have to accept again, good political and economic decisions of this government will be allowed to continue. Generally, an incoming government does not change good decisions by the outgoing government. This in normal, practical and sensible. But bad decisions by outgoing government may have to be reconsidered by the incoming parliament

অপর এক প্রশ্নের জবাবে খালেদা জিয়া বলেছেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি-কে ১৯৭৫ পরবর্তী জাতীয় পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ১৯৯১ সালে আবার আমাদের শূন্য হাতে বিধবস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কাজ শুরু করতে হয়েছিল। ২০০১ সালেও একই ধরনের গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল। আগামীতে দেশবাসী বিএনপি-র ওপর আস্থা রেখে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে সবার সহযোগিতা নিয়ে যতদূর সম্ভব স্বল্প সময়ে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব বলে আশা করি।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্নের জবাবে খালেদা জিয়ার উত্তর ছিল — আমি তো সবসময়ই এ ব্যাপারে সম্মত। এবারেও আমার কাছে প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আনন্দে তাতে রাজি হয়েছি। আমি মনে করি, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি, স্থিতিশীলতা, সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থেই দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের সুযোগ থাকা দরকার। এ বিশ্বাস থেকে একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্যোগ আমি অতীতেও বিভিন্ন সময়ে নিয়েছি, ভবিষ্যতেও নেব। আমাদের মধ্যে আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই। থাকাও উচিত নয়।....আমাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য যদি থাকে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জাতীয় ইস্যুতে আমরা দু'জন যদি একমত হতে পারি, তাহলে দেশের অনেক জটিল সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

খালেদা জিয়ার এ বক্তব্যের বিপরীতে আমরা যদি বিএনপি-র শাসনকালের কথা চিন্তা করি একেবারেই মেলে না। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও অনিশ্চয়তার অনেক কিছুরই বীজ রোপিত হয়েছিল সেই সময়ে। উপর্যুপরি বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা, জঙ্গিবাদকে উস্কে দেওয়া এবং বেছে বেছে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার ঘটনা এখনও দেশবাসীর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া প্রধান দুটি দলের নেত্রী। তাদের মধ্যে বৈঠক হতেই পারে এবং হওয়া প্রয়োজনও। বেরিয়ে আসতে হবে মৌলবাদী জঙ্গিবাদের খপ্পর হতেও। সবশেষে পাওয়া খবর হল, সব পক্ষের অংশ নেওয়া নিশ্চিত করতে নির্বাচন পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর করা হল।

দরং-এ পাকিস্তানী পতাকা

সংবাদদাতা ।। পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এবং বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক চাপান উতোরের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর অসমে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলনের ব্যাপারে সরকার সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। বিরোধীদের দাবি এ ব্যাপারে সি বি আই তদন্ত করা হোক। সম্প্রতি দাঙ্গা কবলিত উত্তর অসমের উদালগুড়ি এবং দরং জেলায় পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। অন্যদিকে অগপ সি বি আই তদন্তের দাবি করেছে। উত্তর অসমে সম্প্রতি জাতিগত দাঙ্গার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভূমিপত্রদের দায়ী করেন। ফলে অভিবাসী মুসলিমদের প্রতি তার নরম মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেছে।

বিজেপি'র জাতীয় সহ-সভাপতি বিজয়া চক্রবর্তী বলেন, এটা খুবই বিপজ্জনক সঙ্কেত। অসমকেও আরেকটি জম্মু-কাশ্মীর বানাতেচাইছে পাক গুপ্তচর সংস্থা। সম্প্রতি উত্তর অসমে বড়ো উপজাতি এবং অভিবাসী বাংলাদেশী মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৫৪টি গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ ঘোষণা করেছেন।

সারের কালোবাজারি

উত্তর দিনাজপুরের কৃষকরা ক্ষোভে ফুঁসছে

মহাবীর প্রসাদ টোডী ।। উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে সার পাচার ও সারের কালোবাজারি বাড়ায় কৃষকরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। এর ফলে যে কোনও সময়ে জেলার আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কৃষকদের অভিযোগ, সরকারের নির্ধারিত মূল্যের থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে তাঁরা সার কিনতে বাধ্য হলেও কৃষি দপ্তর সব জেনেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর প্রতিবাদে গত ১২ নভেম্বর ইটাহার ব্লক কৃষি আধিকারিকের দপ্তরে তৃণমূল কিষাণসভা তালা ঝুলিয়ে দেয়।

এই জেলায় সারের কালোবাজারির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। প্রতি বছরই জেলায় কৃষকদের সারের অভাবে সমস্যায় পড়তে হয়। বর্তমানে রবি শস্যের মরশুম চলছে। কৃষকদের অভিযোগ সরকার নির্ধারিত দামের চাইতে কুইন্টাল প্রতি ৩০০ টাকা বেশি মূল্য দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে। অথচ রসিদ/ক্যাশ মেমো দেওয়া হচ্ছে না। রসিদ চাইলে ব্যবসায়ীরা সার না দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন বলে অভিযোগ আছে। আবার সারের রসিদ দেওয়া হলেও, তাতে সরকারি নির্ধারিত দামই লেখা হচ্ছে। অতিরিক্ত দামের কোনও হিসাব রসিদে লেখা হচ্ছে না।

অন্যদিকে জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক স্বীকার করেছেন যে তারা অসহায়। সার সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতির পরিমাণ নাকি প্রায় ৫০ শতাংশ।

এদিকে তৃণমূল কিষাণ সভার জেলা সভাপতি বলেন যে, সবটাই ভাঁওতাবাজি। চাহিদা অনুযায়ী জোগান না থাকলে কৃষিমন্ত্রী মুখ খুলছেন না কেন? জেলা কৃষি দপ্তর এই বিষয়ে সাহস থাকলে বিজ্ঞপ্তি জারি করুক।

অন্যদিকে এ জেলার রাজনৈতিক মহল এমনও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃষি দপ্তরের একাংশ ও কিছু ব্যবসায়ীদের অবৈধ যোগসাজসে জেলার সার পাচার ও কালোবাজারি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সব কিছু জেনেও কৃষি দপ্তর এবং প্রশাসন থেকে এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? এ প্রশ্ন তারা তুলেছেন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কৃষি দপ্তর ও প্রশাসন উভয় পক্ষই উদাসীন বা নীরব ভূমিকা পালন করছে। অবিলম্বে এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে জেলা জুড়ে গোলমাল চরম আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে অ-কংগ্রেসীদের সম্মেলন

সংবাদদাতা ।। লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা এন সি পি নেতা পি এ সাংমা জানিয়েছেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বেশিরভাগ অ-কংগ্রেসি রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে 'অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসবাদ' এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও বলেন খুব সম্ভবত আগামী ১০ ডিসেম্বর শিলং-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অ-কংগ্রেসি রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হল শান্তি, স্থায়িত্ব এবং উন্নয়ন। এন সি পি'র উদ্যোগে শিলং-এ অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অগপ, বিজেপি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি অংশগ্রহণ করবে বলে শ্রীসাংমা জানান। সম্মেলনে উক্ত অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

সাংমা আরও বলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়েও আলোচনা হবে। সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ এবং জঙ্গি কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

মানুষের সেবার জন্যই শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকৃতি — খাণ্ডুরি

'আধুনিক ভারতে উত্তরাখণ্ড এক বিশেষ পুঁজিনিবেশের রাজ্য হিসেবে উঠে আসছে। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে বি জে পি-র জয় প্রমাণ করল যে, একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষও সরকারের কাজকর্মে খুশী। ক্ষমতায় আসার আগে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং ক্ষমতা অর্জনের পর আমরা যা বলছি তা মানুষ সমর্থন করছে এবং মানুষ তা গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল নতুন নতুন উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে এবং জনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই কথা বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বি সি খাণ্ডুরি। অর্গানাইজারের প্রতিনিধি রবীন্দ্র সাইনি-র সঙ্গে সেই একান্ত আলাপচারিতাটি প্রকাশ করা হল।

❑ সাম্প্রতিক উপনির্বাচনসহ শহরের পুরসভা নির্বাচনগুলিতে এবং সেইসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি-র সাফল্য আপনি কীভাবে দেখছেন?

◆ আমি মনে করি বিজেপি-র এই সাফল্য (গত ১৮ মাসে) সরকারি কাজকর্মে মানুষ খুশী। মানুষের স্বার্থে সরকারি পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। আমি আরও মনে করি যে, ক্ষমতায় আসার আগে আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং ক্ষমতায় আসার পর আমরা যা বলছি তা মানুষ অনুমোদন করেছে। সুতরাং এই সাফল্যের জন্য জনতাকে ধন্যবাদের সঙ্গে

সঙ্গে আমরা সচেতন যে, এই জয় মানুষের প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিল। কাজেই আমাদের আশু কর্তব্য হল, ভবিষ্যতে এক সদুপায়ে মানুষের জন্য উন্নয়নের কর্মসূচী এবং জনহিতকর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

❑ সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ড এক সংবেদনশীল রাজ্য। বিশেষত সন্ত্রাসবাদ এবং মাওবাদী অনুপ্রবেশের বিষয়ে। আপনি এই সমস্যাকে কীভাবে দেখছেন?

◆ ২০০৭ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম তখন এই ইস্যুটা আমি তুলেছিলাম। এই জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক নিরাপত্তা কমিশন গড়েছি। আজকের বাস্তব অবস্থা হল নেপালে সবকিছুই অনিশ্চিত। সেখানে সরকার গড়েছে। আমাদের সঙ্গে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ খোলা সীমানা রয়েছে যেখানে অবাধে প্রবেশ করা যায়। গত কয়েক বছরে নেপালে সশস্ত্র বিপ্লব চলেছে এবং তারা এখন ভারতে গণ্ডগোল পাকাতে পারে। অন্যদিকে চীনের সঙ্গেও আমাদের ৩০০ কিমি সীমানা রয়েছে। চীনও মাঝে মধ্যে তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে এবং সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আমরা সম্ভাব্য মাওবাদী হামলা রুখতে প্রস্তুত এবং চীনের গতিবিধি বিষয়েও আমরা সজাগ।

❑ আপনি বিষয়টা জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে তুলে ধরেছেন। সেখানে কী ঘটলো?

◆ আমি বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পেশ করেছি। আমাদের প্রয়োজন হল পুলিশকে আধুনিকিকরণ করা। এবং সেই সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি করা। যাতে যেকোনও অবৈধ কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের এ কাজে কেন্দ্রের সহায়তা দরকার। এই বিষয়ে কেন্দ্রের সহায়তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু সম্ভাব্য সব কিছু আমরা নিজেদের ক্ষমতায় করছি।

❑ আপনার নতুন শিল্পনীতির ফলাফল কী? কত শিল্প প্রস্তাব এ যাবৎ এসেছে?

◆ শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে আমরা একগুচ্ছ শিল্পনীতি ঘোষণা করেছি। আমরা কিছু প্রস্তাব পেয়েছি, কিন্তু আমরা যেমন আশা করেছিলাম শিল্পপতিদের কাছ থেকে তেমনটা নয়। তবুও আমরা উৎসাহিত করছি যাতে এরা পাহাড়ে আসে।

❑ নতুন বিদ্যুৎ নীতি নিয়ে কী বলবেন।

◆ নতুন শক্তিনীতির লক্ষ্য হল গ্রামের মানুষদের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে উৎসাহিত করা — এই শক্তি ব্যবহার করতেন বিনা ব্যয়ে সরকার সবরকম সুবিধা দেবে, প্রায় ২৫ রকমের শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে চাইছি। এর মধ্যে আসল তত্ত্ব হল, দুই-তিন পর্যন্ত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা স্ব-নির্ভর হতে পারে। আমাদের আশা এর মাধ্যমে সুফল পাওয়া যাবে।

❑ গঙ্গা থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন সাধু সন্তরা। এই সমস্যার সমাধান কী?

◆ এই সমস্যা দুর্ভাগ্যজনক। গোড়া থেকেই আমরা চেষ্টা করছি গঙ্গার শুদ্ধতা বজায় রাখতে। কিন্তু শক্তি উৎপাদনে গঙ্গাকে ব্যবহার না করাটা ঠিক নয়। কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আশা করছি সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। আমরা নদী সমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগিতা সঠিকভাবে ব্যবহার করব, এবং তখনই আমাদের রাজ্যকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে পারব।

❑ আপনার দাবি যে, আপনার রাজ্যে প্রবাহমান গঙ্গার শুদ্ধতা গো-মুখে গঙ্গার যে বিশুদ্ধতা রয়েছে তার মতোই বজায় রাখবেন। এর জন্য আপনার অ্যাকশন প্ল্যান কী?

◆ এই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা কাজ শুরু করব গো-মুখ থেকে। তারপর করব যমুনোত্রীতে। পরে বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার করে দেখব যাতে কোনও বর্জ্য পদার্থ নদীতে না মেশে। এবং আরও নীচে নেমে হরিদ্বারে এসে আমাদের মাপতে হবে কতটা বর্জ্য পদার্থ এসে নদীতে মিশলো। এটা এখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। আমার আশা, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নিশ্চিত কিছু কাজ করতে পারব। এর মধ্যে চারধাম যেমন বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীতে আমরা নতুন কোনও নির্মাণ করতে দিচ্ছি না। এই প্রক্রিয়া নদী কম দূষিত করবে। খুব সুচিন্তিত কিছু নির্মাণের ছাড়পত্র আমরা দেব যাতে কোনও মানুষেরও বর্জ্য নদীতে মিশতে না পারে।

❑ সম্প্রতি সরস্বতী নদী প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কিছু বিশেষজ্ঞ আপনার সঙ্গে দেখা করেছে। যেহেতু নদীটি আপনার রাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করেছে তাই এই প্রকল্পের বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কী?

◆ তাঁরা সরস্বতী নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা তাদের নিজের মতো করে নদীর গতিপথ চিহ্নিত করেছেন। আমি মনে করি, এই মুহূর্তে এ বিষয়ে উত্তরাখণ্ডের বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। আমি তাদের বলেছি, রাজ্য সরকারের কাছে প্রকল্পটাকে নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করলে, বিষয়টি নিয়ে সরকার ভাববে।

❑ উত্তরাখণ্ডে অনেক পূর্ব-সৈনিক রয়েছেন। আপনি এঁদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কী করছেন?

◆ আমরা পূর্ব-সৈনিকদের জন্য ইতিপূর্বে অনেক কিছু করেছি মূলতঃ দুটো কারণে। এক, উত্তরাখণ্ডে প্রভূত সংখ্যায় পূর্ব-সৈনিকরা রয়েছেন। এঁদের থেকে ৪০০ জনকে নিয়ে গড়েছি 'ইকো-টাস্ক ফোর্স'। আমরা এঁদের জন্য কুমায়ুনী ও গাড়োয়াল অঞ্চলে হাউজিং-র ব্যবস্থা করেছি। গাড়োয়াল, কুমায়ুনী পূর্ব-সৈনিকদের জন্য

(এরপর ১৩ পাতায়)

সন্ত্রাস নয়, নির্বাচিত সরকার চায় কাশ্মীর

নিজস্ব সংবাদদাতা।। এ বছর জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার পর পরই ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীনতা অথবা পাকিস্তানে মিলে যাওয়ার প্রকাশ্য দাবিদার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জোট 'অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স'। তাদের নেতারা ভোট বয়কট করার জন্য কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের উপর একতরফা ফতোয়া জারি করে। কিন্তু দু'দশকের বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসবাদের কশাঘাতে জর্জরিত উপত্যকাবাসীরা সে ডাক উপেক্ষা করে। প্রথম দফায় প্রায় চৌষট্টি শতাংশ ভোট পড়েছে। যা এক কথায় ইদানীংকালের মধ্যে সর্বাধিক বলা যেতে পারে। আরও কয়েকদফা নির্বাচন বাকী আছে। প্রাকৃতিক অসুবিধার কারণে জম্মু-কাশ্মীরে একদিনে নির্বাচন কখনও সম্ভব হয় না। এই ব্যাপক ভোট পড়ার ফলে বোঝা যাচ্ছে উপত্যকার সাধারণ মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রশাসনে আগ্রহী। তাদের কাছে প্রাথমিক জীবন-যাপনের আবশ্যকতা — বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও রাস্তার গুরুত্ব বেশি।

দিল্লীতে চিকিৎসালয়ের বেডে শয্যাশায়ী হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানী (গিলানী গোষ্ঠী) সব থেকে কঠোর ভাষায় নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিলেন। এখানে সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো দরকার যে 'হুরিয়ত' শব্দের অর্থ হল স্বাধীনতা। শ্রীনগরের হুরিয়ত অফিসের সাইনবোর্ডে হুরিয়তের পাশে ব্র্যাকেটে 'ফ্রীডম্' কথাটি

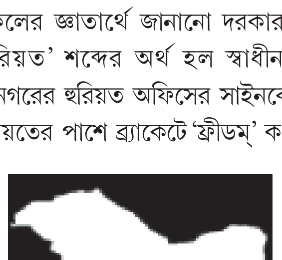

লেখা আছে। আবার এই হুরিয়তকেই ভি পি সিং, মনমোহন সিং মায় আদবানী পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সঙ্গেই বৈঠক করে কথাবার্তা বলেন। আর হুরিয়ত নেতারা সাধারণত দিল্লী এলেই একবার পাকিস্তান দূতাবাসে ঘুরে যান — বৈঠক করে ফেরেন। গিলানীর ফতোয়া ছিল, তার ফতোয়া অগ্রাহ্য করে যারা নির্বাচন লড়বে তাদেরকে সামাজিক বহিষ্কার করা হবে। এবার জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় নির্বাচন সাত দফায় হবে। প্রথম দফার নির্বাচন ১৭ নভেম্বরে দূর-দূরান্তের বিশেষ করে পাকিস্তান সীমাবর্তী এলাকায় নির্বাচন হয়েছে। পরের ছয় দফাও ভালোই ভোট পড়বে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ভোট বয়কট যে প্রাত্যহিক সমস্যার কোনও সমাধানই নয় তা বুঝছেন উপত্যকার মানুষ। যে দলই ক্ষমতায় আসুক তাকে জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। দেখা যায় যখনই সরকার মানুষের বিশ্বাস হারায়, জনপ্রিয়তার পারদ নীচে নামতে থাকে তখনই ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ ও সমর্থন দেওয়া বাড়তে থাকে। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রথম দফায় ৬৪ শতাংশ ভোট পড়ছে। ২০০২ সালে সারা রাজ্যে ভোট পড়েছিল ৪৪ শতাংশ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বায়ত্তশাসন, পাকিস্তানের সঙ্গে অবাধ যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পি ডি পি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স বলেছে। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দেওয়া নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন পি ডি পি-কংগ্রেস জোট সরকার ভেঙে যায়। জম্মুর হিন্দুরা মূলগতভাবে বিজেপি-র সমর্থক। বিজেপিই একমাত্র দল যারা জম্মুবাসীর আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিল। এছাড়া মায়াবতীর দলও অনেক আসনে প্রার্থী দিয়েছে। যার ফলে কংগ্রেসের কপালে ভাঁজ পড়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখন অবধি ন্যাশনাল কনফারেন্স-কে এক নম্বরে এবং তারপরে বিজেপি আর কংগ্রেসকে তিন নম্বরে রেখেছেন। অবস্থা যা তাতে হ্যাং-অ্যাসেম্বলির সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে পৃথকভাবে লড়াই করলেও পরে কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স সুবিধাবাদী জোট হতেই পারে। যেমনটা আগের বার পি ডি পি — কংগ্রেস জোট হয়েছিল। তবে এখনও অনেক দেরি আছে ফলাফল পুরো প্রকাশ হতে। ভোটই এখনও শেষ হয়নি, তাই ভবিষ্যদ্বাণী করাটা ঠিক নাও হতে পারে। বাস্তুচ্যুত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি হলেও তাদের মাত্র ৭২০০০ বিধানসভার ভোটার। বাকীদের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটাধিকারই নেই। পণ্ডিতরা এবার নতুন দল গড়ে নির্বাচনে নেমেছেন। উপত্যকাতে এখন মাত্র তিন হাজারের মতো পণ্ডিত কোনওক্রমে টিকে আছেন। ২০০২-এর নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রমন মট্টুই নির্বাচনে জিতেছিলেন।

এবার বিজেপি'র একজন সহ মোট কুড়িজন পণ্ডিত নির্বাচনী আসরে রয়েছেন।

রাজ্য জুড়ে লোডশেডিং আর কতদিন ?

নবকুমার ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার সময় দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১ হাজার ৩৬২ মেগাওয়াট। আজ উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। শহর পেরিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে দেশের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামেও। ২০১২ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করে দু'লক্ষ মেগাওয়াটে পৌঁছে দেবার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। অথচ গত গ্রীষ্মের তুলনায় এবার কেবল কলকাতায় লোডশেডিং বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। ২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

লোডশেডিং-এর খতিয়ান (ইউনিট)

	২০০৭	২০০৮
জানুয়ারি	৮ লক্ষ	৩৩ লক্ষ
ফেব্রুয়ারি	২ লক্ষ	১৭ লক্ষ
মার্চ	৭ লক্ষ	৪৪ লক্ষ
এপ্রিল	৪৩ লক্ষ	৯১ লক্ষ
মে	২২ লক্ষ	৫১ লক্ষ
জুন	৩৩ লক্ষ	১.৩৩ কোটি
জুলাই	৪৩ লক্ষ	১.৪৭ কোটি
আগস্ট	২২ লক্ষ	১.৫ কোটি
সেপ্টেম্বর	৩৯ লক্ষ	৪৬ লক্ষ

এই ছয় মাসে শহরে বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল ২ কোটি ১৭ লক্ষ ইউনিট। এ বারের গরমকালে ঘাটতি ছিল ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ইউনিট। বিদ্যুৎ কর্তাদের হিসাব মতো আসন্ন শীতের মরসুমেও বিদ্যুতের ঘাটতি থেকেই যাবে। তাই এ বছর শীতকালেও লোডশেডিং হবে। গ্রীষ্ম এবং শীতের সময়ে বিদ্যুতের চাহিদার ফারাক ২০০ মেগাওয়াট। তাই এই সময়ে অর্থাৎ শীতকালে মেরামতির জন্য বসিয়ে দেওয়া হয় একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট। এ বছরও সি ই এস সি একে একে মেরামতির জন্য বিশ্রাম দেবে তাদের টিটাগড়ের দুটি ৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট, সাদার্ন কেন্দ্রের একটি ৬৭.৭ মেগাওয়াটের ইউনিট এবং বজবজের একটি ২৫০ মেগাওয়াটের ইউনিট। একইভাবে মেরামতির জন্য বিশ্রাম দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমও। তাই বিদ্যুতের চাহিদার পাশাপাশি কমবে জোগানও। যে ইউনিটগুলি চলার অবস্থায় থাকবে, কয়লার অভাবে সেগুলিও চলবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের দেশে প্রতি ভারতীয়ের গড় বার্ষিক বিদ্যুৎ ব্যবহার মাত্র ৩৬০ ইউনিটের মতো। বিশ্বমানে এই অঙ্কটা অবশ্য বেশ কম। সন্ধ্যায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদার সময় ঘাটতি ১৫ শতাংশ। সারা বছরে মোট চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের জোগান প্রায় দশ থেকে বারো শতাংশ কম। যদিও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি বহু হাজার গ্রামে। যে পাঁচ ছয় লক্ষ গ্রামকে বিদ্যুতায়িত বলে দাবি করা হচ্ছে সেখানে গ্রামের ক'টি বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে তার হিসাব নেই। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ২১১ ইউনিট মাত্র। পূর্ব ভারতের গড় ২০১ ইউনিট। প্রতিবেশী ওড়িষা এ রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে। ওদের গড় ৩১৩ ইউনিট। ১৯৯১ সালে আর্থিক সংস্কার শুরু হওয়ার পর, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য। আইন করে বলা হল — এই ব্যবসায় টাকা ঢাললে একটা ন্যূনতম লাভের গ্যারান্টি মিলবে যার জন্য জামিন থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার। বিদেশী ঋণ মিলছে। বিদেশি ঋণ অর্থাৎ জাপানি ঋণ নিয়ে এরাজ্যে গড়ে উঠেছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। অবশ্য প্রচার হয়েছে সিপিএম দলের ক্যাডারদের রক্ত দিয়েই নাকি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। জাপানি ঋণ নিয়ে তৈরি হয়েছে 'তিস্তা ক্যানাল ফল' জল বিদ্যুৎ প্রকল্প;আর পুরুলিয়া পাম্পড্ স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

বিদেশি ঋণ বা সরকারি অর্থই হোক, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বিদ্যুৎ ব্যবসার লাভালাভের উপর। বিপুল পরিমাণ সরকারি ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবও নয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মোট ভর্তুকি ছিল ২০ হাজার ২১০ কোটি টাকা। ২০০০-০১সালে ওই ভর্তুকি বেড়ে দাঁড়ায়

লোড শেডিংয়ের হাত থেকে রেহাই নেই স্বাস্থ্ কেন্দ্রেরও। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে চলছে রোগিনীর চিকিৎসা।

৩৭ হাজার ৪৭ কোটি টাকায়। এই ভতুর্কি কেন ? ২০০০-০১ সালে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে খরচ হতো গড়ে ৩০৪ পয়সা আর গড় মাসুল ছিল ২১২ পয়সা। এই অবস্থায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করে লোকসান হত ৯২ পয়সা।

রাজ্যে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে, কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর দায়িত্ব আজ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এবং সি ই এস সি-র। কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সি ই এস সি আর গ্রামাঞ্চলে এই দায়িত্ব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের। সি ই এস সি-র বন্টিত বিদ্যুতের একটি অংশ তারা নিজেরাই উৎপাদন করে। বাকি অংশ তারা সস্তা দরে কেনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কাছ থেকে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ নিজেদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ছাড়া বিদ্যুৎ কেনে ন্যাশন্যাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন থেকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবসায় উভয় সংস্থাই নাকি আজ ক্ষতিতে চলছে। আর ক্ষতির দোহাই দিয়ে উভয় সংস্থাই কোপ মারছে গ্রাহকদের উপর। দামের উপর দাম বাড়ছে বিদ্যুতের। অথচ লোডশেডিং-এর বহর চলছে ঘন্টার পর ঘন্টা। বারে বারে বিদ্যুতের দাম বাড়ায় এবং

বিদ্যুৎ উৎপাদন (ইউনিট)
(জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর)

২০০৭	৫০৫ কোটি
২০০৮	৫২১ কোটি

লোডশেডিং-এর অত্যাচারে নাজেহাল রাজ্যের গ্রাহকরা। মনের মধ্যে ক্ষোভ চেপে রেখে, মাসের নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের ক্যাশ কাউন্টারে জমা দেন বিদ্যুতের বিল। এতেও খুশি নয় সংস্থা দুটি। নানা অজুহাতে গ্রাহকদের কাছ থেকে আরও অর্থ উপায় করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্যদ লোকসানের মূল কারণ হিসেবে বন্টন ও সঞ্চালনের ক্ষতি দেখিয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'টিডি লস'। তাছাড়াও এই ক্ষতির মধ্যে বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেড়েছে তাও দেখানো হয়েছে।

সি ই এস সি'র ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব কল্পনা। কারণ, সি ই এস সি-র ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড কেবল থাকায় ক্ষতি অবাস্তব নয় কি? তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার 'হিট রেটিং' কমিটির নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ উভয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়ে দেখিয়েছে। যেখানে ১ একক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত খরচ ৬০০ গ্রাম কয়লা ও ৩.৫ মিলি লিটার তেল প্রয়োজন সেখানে উভয় সংস্থাই এই হিসাব দিয়েছে ৭০০ গ্রাম কয়লা এবং ৬.৫ মিলি লিটার তেল। যদিও কারোরই সার্বিক 'এনার্জি আউট' হয়নি। ক্ষতি মাপার জন্য কোনও মিটার রিডিংয়ের ব্যবস্থাও নেই।

সি ই এস সি বারবার অযৌক্তিকভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। গোয়েঙ্কাদের এই মুনাফা বাড়ানোর কৌশলে শাসকদলের বদান্যতা থাকায় গ্রাহকরা বিপর্যস্ত হয়েছে বারংবার। শুধু গ্রাহকরা নয়, সি ই এস সি-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে খরচের তুলনায় উৎপাদন কম দেখানো এবং বন্টন ও সঞ্চালনের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেনকে মন্ত্রিত্বও খোয়াতে হয়েছে। সি ই এস সি-র বেহিসেবি খরচের দায় গ্রাহকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন যুক্তিতে সি ই এসি 'আর পি জি' লোগো ব্যবহারের জন্য বছরে ৪ কোটি টাকা গ্রাহকদের থেকে আদায় করছে? এর পরেও কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা নেই।

বিদ্যুৎ আমদানি
(জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর)

২০০৭	৯৩ কোটি
২০০৮	১১৩ কোটি

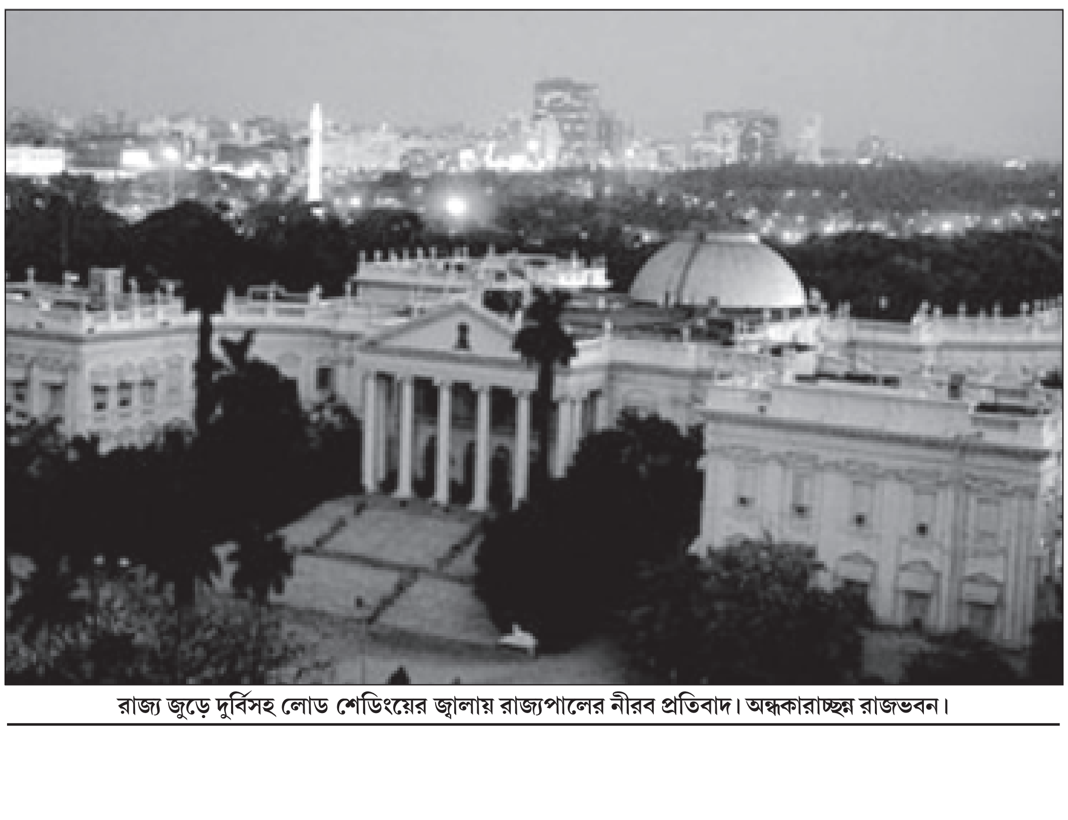

রাজ্য জুড়ে দুর্বিসহ লোড শেডিংয়ের জ্বালায় রাজ্যপালের নীরব প্রতিবাদ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজভবন।

বিদ্যুতের হুকিং হয় না এমন গ্রাম নেই পশ্চিমবঙ্গে

বিশেষ সংবাদদাতা ।। সি ই এস সি'র বিজ্ঞাপন — 'বিদ্যুৎ চুরির খবর জানাতে ফোন করুন ১৯১২'। সকলের চোখে পড়বে কিন্তু সি ই এস সি-র পুকুর চুরি ধরবে কে? বিদ্যুৎ চুরির দোহাই দিয়ে সি ই এস সি নিজেরাই কীভাবে পুকুর চুরি করছে একটা

বিদ্যুৎ বিলের বিরোধ নিয়ে কোনও গ্রাহক বা স্থানীয় লোক হাইকোর্ট পর্যন্ত কোথাও বিচার চাইতে পারবেন না। একমাত্র তিনি সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই আইনের সুযোগ নিয়ে সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদ সাধারণ মানুষের পকেট কাটতে ব্যস্ত।

উদাহরণ দেখলেই তা স্পষ্ট হবে। সি ই এস সি লস কনজাম্পসন সেল বা এল সি যে কোনও গ্রাহককে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে হয়রান করতে পারে এবং হায়রানি করে চলেছেও। এই ইউনিটের একটি দল হঠাৎ করে যে কোনও গ্রাহকের বাড়িতে ঢুকে মিটার খুলে নিজেদের দেওয়া মিটার সিলটি ডুপ্লিকেট সিল বলে গ্রাহককে নোটিশ দিচ্ছে। কোনও কথা না শুনেই বিশাল অঙ্কের টাকা জরিমানাও করছে।

১৯১০ সালের বিদ্যুৎ আইনের ২৬(২) ধারায় গ্রাহকরা মিটার কিনে নিতে পারেন। কিন্তু সি ই এস সি গ্রাহকদের সেই সুযোগ না দিয়ে প্রতিমাসে মিটারের ভাড়া নেন। সি ই এস সি-র চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কাশীপুর, টিটাগড়, মূলাজোড় এবং বজবজে পদ্ধতিগত কারণে চার ধরনের কয়লা ব্যবহার করা হয়। এই চার ধরনের কয়লার দামের মধ্যেও যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। অর্থাৎ বজবজে যদি 'এ' গ্রেডের কয়লা ব্যবহার করা হয় তবে কাশীপুরে ব্যবহার হবে 'ডি' গ্রেডের কয়লা। এই চারটি গ্রেডের দামের মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। অথচ যে কেন্দ্রে কম দামের কয়লা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কেন্দ্রের গ্রাহকদের বিল কিন্তু 'এ' ভুক্ত গ্রাহকদের মতোই আসছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এখনও ২৫ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুতের মিটার দিতে পারেনি। যদিও তাদের কথায় তা ১০ শতাংশ মাত্র। মিটার না দিয়েও বেশির ভাগ এলাকায় আলো জ্বালানোর অনুমতি দিয়েছে পর্ষদ। অথচ মিটারহীন গ্রাহকদের মিটার রিডিং ছাড়াই বিদ্যুৎ বিল আসছে বিরাট অঙ্কের। অথচ এসব নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিকার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ ২০০১ বিদ্যুৎ বিলে রয়েছে এমন কিছু অংশ যা জনস্বার্থ বিরোধী। এই বিলে বিদ্যুৎ শিল্পে ভর্তুকি কমিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্টন ও সঞ্চালন ব্যবস্থাকে পৃথক করা হবে, ফলে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। এই বিল অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেও সকলকেই হুকিং চার্জ ও ফিক্সড চার্জ দিতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পঞ্চায়েত, সমবায় ও ঠিকাদারের হাতে এবং বৈদ্যুতিককরণের সব দায়িত্ব ঠিকাদার সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিয়োজিত ব্যক্তি যে কোনও গ্রাহকের বাড়িতে যে কোনও সময় ঢুকে তল্লাশি চালাতে পারবেন। সন্দেহ হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অভিযুক্ত করা ও লাইন কেটে দেওয়া হবে। চুরির অভিযোগে দু'বছর জেল হতে পারে। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা করা যাবে না।

বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে লেখাপড়ার সম্বল সেই হ্যারিকেন।

বিদ্যুৎ বিলের বিরোধ নিয়ে কোনও গ্রাহক বা স্থানীয় লোক হাইকোর্ট পর্যন্ত কোথাও বিচার চাইতে পারবেন না। একমাত্র তিনি সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই আইনের সুযোগ নিয়ে সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদ সাধারণ মানুষের পকেট কাটতে ব্যস্ত।

তবে কি বিদ্যুৎ চুরি হয় না? পশ্চিমবঙ্গের এমন গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে হুকিং হয় না। এই হুকিং-এর বিরুদ্ধে কিছু করার সাধ্য নেই বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তাদের। পর্ষদের অভিজ্ঞতা সি পি এম প্রভাবিত এলাকাতেই চুরির হার সব থেকে বেশি। সি পি এমের গ্রামীণ নেতারা মনে করেন — বিদ্যুৎ বামফ্রন্টের, জনগণও বামফ্রন্টের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া, চৈতন্যপুর, পটাশপুর, ভগবানপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ও ঘাটালে বিদ্যুৎ চুরি হয় সব থেকে বেশি। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চুরির। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, বীরসিংহ, দাসপুর, পটাশপুর, কোলাঘাটসহ গ্রামাঞ্চলের সব জায়গায় জল সেচের জন্য স্যালো মেসিন চলছে অবৈধভাবে। পর্ষদের মতে, জেলায় বিদ্যুৎ ঘাটতির একটা বড় কারণ কৃষকরা স্যালো চালাবার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে মিনি ডিপ টিউবওয়েল চালাচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিদ্যুৎ চুরির ক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম ট্যাংরা কলোনি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের হিসেবে এই গ্রামেই সবচেয়ে বেশি হুকিং রয়েছে। বস্তুত নদীয়া মুর্শিদাবাদ মালদা সীমান্তবর্তী সমস্ত অঞ্চলেই হুকিং-এর রমরমা। কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু অঞ্চল বলে ওই এলাকাগুলিতে ঢুকতেই পারেন না অপরাধী ধরার জন্য। অথচ সংখ্যালঘু অঞ্চল বলে বিদ্যুৎ গ্রহীতাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য প্রাধান্য দিতে হয়। সীমান্ত এলাকার অনেক গ্রামেই আট দশটি বাড়িতে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে কিন্তু আলো জ্বলে গ্রামের ঘরে ঘরে। হুকিং সমবায়ে জেরবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উত্তরবঙ্গ জোনও। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ জোনের চূড়ান্ত চাহিদা ৩৮৪ মেগাওয়াট। একে বলে ' পিক ডিমান্ড'। 'অফ পিকে'র ডিমাণ্ড ৩২০ মেগাওয়াট। চাহিদা বাড়ছে কিন্তু বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না টাকা। সাধারণ গ্রাহকদের চাইতে বকেয়া বিলের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে সরকারি সংস্থাগুলি।

বিদ্যুৎ চুরির জন্য অনেক সময় বিদ্যুৎ কর্মীরাই নাকি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তারাই হপ্তা তোলেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে। সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন না হলে কিছু হবে না। অপরদিকে বহু মানুষ মিটারের জন্য টাকা জমা দিয়েও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে এখনও বঞ্চিত।

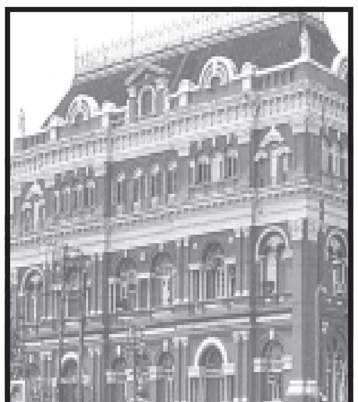

মহাকরণেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মহাকরণে তিন নম্বর গেটের সামনে ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে বিকল হয়ে যাওয়ায় (গত ১৮ নভেম্বর) মহাকরণ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বেলা বারোটা নাগাদ। এর আওতা থেকে বাদ যায়নি ভিআইপি এনক্লেভও। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সে সময় একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তার ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটে লিফট কাজ না করায়, তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়।

এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য মহাকরণে সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

— হিন্দুস্থান সমাচার

বিদ্যুৎ ছাড়াই ফ্রিজ

বি স কে, কলকাতা ।। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সৃষ্ট মডেলের বিদ্যুৎবিহীন রেফ্রিজারেটর হয়ত শীঘ্রই বাজারে আসছে। ১৯৩০ সালে আইনস্টাইন এই মডেল আবিস্কার করেন। আইনস্টাইন ও তাঁর সহকর্মী হাঙ্গেরির পদার্থবিদ লিও সিলার্ড শুধুমাত্র চাপমাত্রিক গ্যাসের সাহায্যেই ভেতরের বস্তু ঠাণ্ডা রাখার প্রক্রিয়া আবিস্কার করেন। আধুনিক রেফ্রিজারেটের যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই ফ্রেয়ন কার্বনডাই অক্সাইডের থেকেও আরও ক্ষতিকারক। ম্যালকম ম্যাকুলার অক্সফোর্ডের এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তিন বছরের গবেষণায় এমন ফ্রিজ আবিস্কার করেছেন, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই চলবে।

প্রথমে আইনস্টাইন সিলার্ড আবিস্কৃত মডেলের অনুকরণেই আধুনিক ফ্রিজ তৈরি হত। ১৯৫০ সালের পর উন্নততর প্রযুক্তি আবিস্কারের ফলে পূর্বের মডেল বাতিল হয়। কিন্তু আইনস্টাইন-মিলার্ডের ভাবনা ছিল ক্ষতিকারক ফ্রেয়ন গ্যাস ছাড়াই ফ্রিজ চালানোর।

চিঠিপত্র

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার প্রবন্ধ

প্রতি বছরের মতো এবারও 'স্বস্তিকা'র পূজা সংখ্যা (১৪১৫ সাল ৬.১০.০৮) একটি ব্যতিক্রমী সঙ্কলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্নধর্মী বিষয়বস্তুর সম্পর্কে আলোচনায় সম্পৃক্ত প্রবন্ধগুলির সবগুলিই প্রখ্যাত লেখকদের জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। পূজা সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সেদিক থেকে পাঠকদিগের বিবেককে ভাবনা চিন্তার উচ্চস্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রবন্ধগুলির সম্পর্কে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনাসহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমেই শ্রী কে এস সুদর্শনজীর 'ভারতবর্ষ এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বলেছেন, আমাদের ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তি হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং এই জাতীয়তাবাদের উৎস হচ্ছে একাত্মবোধ। একাত্মবোধ রয়েছে বলেই, আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হলেও বৃক্ষ, লতা,পশু-পক্ষী, নদী, পর্বত, তীর্থস্থানগুলিও ভারতের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত। ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, দেবী পীঠস্থান, কুম্ভমেলা ও বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলি হিন্দুদের একাত্মবোধের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই সংস্কৃতির প্রভাবেই এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভারত এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক জাতি। এই প্রবন্ধ থেকে সাধারণ হিন্দুরা জাতীয়তাবোধের প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। সেই দিক থেকে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'আত্মার রহস্য উন্মোচন জড় বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব' প্রবন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী জানিয়েছেন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষ বা অন্যান্য জীবের প্রতিরূপ (ক্লোনিং) তৈরি করা সম্ভব হলেও আত্মার প্রতিরূপ তৈরি করা বা 'ক্লোন' করা কোনও মতেই সম্ভব হতে পারে না। কারণ জড়বিজ্ঞানীদের যন্ত্রপাতি দিয়ে আত্মাকে জানার পরীক্ষা করা যায় না। ভারতের আধ্যাত্মিক পথ ছাড়া আত্মাকে জানার অন্য কোনও উপায় নেই। ভগবানকে দেখার যন্ত্র তৈরি করা যায় না।

'আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ঃ ভারতের কাঙ্খিত ভূমিকা' — এই প্রবন্ধের লেখক দেবীপ্রসাদ রায় বলেছেন, আয়ুর্বেদ বেদেরই একটি অংশ, ভারতীয় বিশ্বাস মতে 'ব্রহ্মা'ই এর উৎস। ভারত সরকারের পক্ষে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা স্বীকৃত হলেও আয়ুর্বেদের সার্বিক প্রচারে ভারত সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। বহুজাতিক কোম্পানীর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ তৈরির দাপটে দেশীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির কোম্পানীগুলি ম্লান হয়ে পড়ছে।

'ভ্রান্ত পথের পথিক ডিরোজিও' — এই প্রবন্ধে লেখক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র ব্যর্থ শিক্ষানীতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বহির্ভূত নেতিবাচক পাশ্চাত্যকরণ ও নাস্তিকতার উপর ডিরোজিও যে চেতনার জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, কালের বিচারে তা ব্যর্থ ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে।

'মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ ফজলুল হক থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য' — শীর্ষক সময়োচিত প্রবন্ধটি লিখেছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। এই মাদ্রাসা শিক্ষার নীট ফল — মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর ও দক্ষিণ) সহ মোট ১১টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বা মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার ৬৮৬ কোটি টাকা সাহায্য দিচ্ছে। ওই টাকায় রাজ্য জুড়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচাগার নিকাশী ব্যবস্থা ও মুসলিম শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করা হবে। এই যে নগদ ৬৮৬ কোটি টাকা প্রাপ্তি — এর ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, লোকসভায় ও রাজ্যসভায় ভোটে জিতে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রাপ্তি — সব কিছুরই মূলে রয়েছে এই ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই সতর্কবাণী শুনিয়েছেন লেখক।

'শতবর্ষের আলোকে ১৯০৮ সালের বোমার গল্প শুনিয়েছেন লেখক অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্তমান প্রজন্মের যুবকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের আদর্শ উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত হওয়া।

বীর সাভারকর স্বাধীন ভারতে উপেক্ষিত হলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন লেখক নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য তাঁরই বিপ্লবী বীর সাভারকর উপেক্ষিত কেন শীর্ষক প্রবন্ধে। দেশের হিন্দু ও জাতীয়তাবিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিদেশী অর্থপুষ্ট সংবাদ মাধ্যম কেউই চায়নি যে, দেশে একটি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তৈরি হোক। এই জন্যই বৃটিশ সরকার একটি নড়বড়ে বৃটিশ স্বার্থপুষ্ট রাজনৈতিক দলের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করেছিল, যাতে তারা বৃটিশের অঙ্গুলি হেলনে সরকার চালাতে পারে। এ জন্যই নেতাজী ও বীর সাভারকরের মতো বলিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত নেতাদের অবজ্ঞা করে চলেছে এখনও।

ভারতে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে লণ্ডনে ১৯০৫ সালে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রকৃত ভারতপ্রেমী ইংরেজদের নিয়ে ১৯০৫ সালের ২৯ জুলাই প্রথম সভা করেছিলেন লণ্ডনে সোসাইটির লক্ষ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে ভারতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন। এই সম্পর্কে আলোকপাত করে নতুন নতুন তথ্য দিয়ে 'স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য।

ভারতের সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রে সঠিক দিশা দেওয়ার পরিবর্তে মিথ্যা ও একপেশে প্রচার করে গণতন্ত্রের বিকৃতি ঘটাচ্ছে — এই অভিযোগ এনেছেন 'চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক তথাগত রায়।

মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান এই হিন্দুত্ববোধ। হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব একমাত্র হিন্দুদেরই নিতে হবে। এজন্য চাই দৃঢ়, শক্তিশালী সংগঠন, প্রবল স্বাভিমান ও জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম। হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আঘাত চলছে ভারতের ভিতরে ও বাইরে থেকে। 'হিন্দুত্ব' সম্পর্কে বিশেষ তথ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক ডঃ প্রীতিমাধব রায় এই সব বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা প্রত্যেক হিন্দুরই বিশেষত নতুন প্রজন্মের যুবকদের অনুসরণ করা উচিত।

'অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা' — শীর্ষক প্রবন্ধেও ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসাক ভারতীয় পুরাণকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিকেরা যে Myth বলেন যেখান থেকে Mythology কথাটা চালু হয়েছে, সেটা যে কত বড় মিথ্যা, তারই প্রমাণ দিয়েছেন, অগ্নিপুরাণ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে।

'সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চল' — শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সুবীর ভৌমিক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন।

গোর্খাল্যাণ্ড বা গোরক্ষভূমি কোন্ নিরিখে তৈরি হবে? একটা আলাদা রাজ্য গঠন করতে হলে তার রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক একাত্মতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। বঙ্গভূমির সঙ্গে গোরক্ষভূমির কোনও সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলা কি সম্ভব? গুরু গোরক্ষনাথের ভক্তরা নেপাল, দার্জিলিং ও পাহাড়ী এলাকায়, রাজস্থানের ক্ষত্রিয় রাজপুতরা এবং নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। কারণ, গুরু গোরক্ষনাথ নেপালে তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সারা ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে বিবরণ করে অসংখ্য ভক্ত শিষ্য তৈরি করেছেন। এই উত্তর-পূর্ব ভারতের বঙ্গদেশে তাঁর জন্মস্থান। এই অবস্থায় কোনও মাপকাঠির মাধ্যমে গোরক্ষভূমি বা গোর্খাল্যাণ্ড তৈরি হবে? — এই প্রশ্ন তুলেছেন ডঃ বলরাম চক্রবর্তী তাঁর 'গোর্খাল্যাণ্ড নির্দ্ধারণের মাপকাঠি কেমন হবে?'- শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে। বহু তথ্য ও যুক্তি দিয়ে গোর্খাল্যাণ্ডের সমাধানসূত্র বার করবার চেষ্টা করেছেন।

সাধনানন্দ মিশ্র, কলকাতা।

জনমত

আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে বাঁচতে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চাই

গোপাল সাহা

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু এবং পথ প্রদর্শক কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখলে মন্তব্য করেছিলেন 'আজ বাঙালী যে চিন্তা করে আগামী দিনে ভারতবর্ষ সেই চিন্তা করে।' আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ বলেছিলেন ঃ "বাঙালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। কারণ বাঙালীর শিক্ষার অগ্রগতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং দেশপ্রেমে সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করেছে।"

কিন্তু বিশ্বের কিছু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মৌলবাদী চক্র, সন্ত্রাসবাদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভোটের স্বার্থে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত কাজের ফলে আজ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বাঙালীরা পিছিয়ে পড়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। এক নেত্রী সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা, প্রত্যেকটি দূরদর্শন চ্যানেল এবং সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীরা যেভাবে রিজয়ানুর রহমানের আত্মহত্যার ঘটনায় সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করার জন্য রাজপথে নেমেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখি যে সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীরা, দূরদর্শন ও সংবাদমাধ্যম অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে কেরোসিন ঢেলে তার শ্যালক (মুসলমান) যখন তাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করার জন্য, জঘন্য প্রচেষ্টা চালায় (বাদুড়িয়া) এবং মুম্বাই নিবাসী ৩২ বছরের যুবক শৈলেন্দ্র প্রসাদ যিনি ধর্মান্তরিত না হয়ে বহরমপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের মনেরা খাতুনকে রেজেস্ট্রি করে বিবাহ করার অপরাধে মনেরার নিকট আত্মীয় ও গ্রামবাসীরা সালিশি বিচার করে, পশুর মতো মুণ্ড থেকে ধড় আলাদা করে হত্যা করে পাটক্ষেতে পুঁতে দেয়, তখন এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা একটি কথাও উচ্চারণ করেন না;দূরদর্শন এবং সংবাদ মাধ্যমে তার যথার্থ প্রচার হয় না। তাই একথা মনে হয় যে রিজয়ানুর রহমানের আত্মহত্যার ঘটনায় যারা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন তারা সত্যিকারের প্রতিবাদী অথবা মানবতাবাদী নন, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ডামি করাই তাদের একমাত্র কাজ।

যে কোনও মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। সেই কারণে ওড়িশার ধর্মযাজক স্টেইন এবং তাঁর দুই নিরপরাধ শিশুপুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে, যে সমস্ত নেতা ও নেত্রীগণ তার প্রতিবাদে সোচ্চার হন, তারা সত্যই প্রতিবাদী বলে অশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এইসব প্রতিবাদীগণ দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাকুড়দহ গ্রামে সেখানকার রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হরিসাধন দাস বাবাজী মহারাজকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা কেরোসিন ও পেট্রোল ঢেলে জীবন্ত অবস্থায় হত্যা করে, তার প্রতিবাদে একটি বাক্য উচ্চারণ করেন না তখন তাঁদের ভণ্ডামির নিন্দা করার কোনও ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এই বৎসর যখন একদল দুষ্কৃতকারী বালুরঘাটে পশুর মাংস ও হাড় নিক্ষেপ করে দুর্গা প্রতিমা অপবিত্র করে এবং পূজা-উদ্যোক্তাদের পুলিশের সামনে আক্রমণ করে, দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেয়, তার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে বাঙালী হিন্দুরা সোচ্চার হয় না, তখন মনে হয় বাঙালী প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

গত বৎসর ২১ নভেম্বর, ০৭তারিখে বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের দাবিতে কলকাতার বুকে এক দল সমাজবিরোধী বিনা প্ররোচনায় নিরীহ পথচারী এবং পুলিশকে আক্রমণ করে। গাড়ি ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে কলকাতার বুকে অরাজকতা সৃষ্টি করে, তখন কিন্তু কোনও বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা এবং গণসংগঠন তার প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু যখন তিন পুলিশ কর্তা জামিন পায়, তখন তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা প্রকাশ্যে আনন্দ উৎসব করে তার প্রতিবাদে একদল লোক নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে তার প্রতিবাদ করেন, তার কারণ কী? আমরা জানি না।

পাকিস্তানের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে যে মুসলিম লীগ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে হত্যা করে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাজন করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সেই মুসলিম লীগ আজ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু যে দল এক দেশে একই আইন চায়, ৩৭০ ধারার বিলোপ দাবি করে সেই দল আজ সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ভূষিত। অন্যদিকে তদানীন্তন সমগ্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দী ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে "দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" সংগঠিত করে কলকাতা এবং নোয়াখালিতে কয়েক হাজার নরনারীকে হত্যা করে। সেই সুরাবর্দীকে স্মরণীয় করার জন্য তার নামে কলকাতার বুকে রাস্তার নামকরণ করা হয়, অথচ লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা তদানীন্তন কালের ভারতবর্ষের বিখ্যাত ব্যারিস্টার এবং রাজনৈতিক নেতা নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাঁর সম্মানে ও স্মরণে কলকাতার কোনও রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয় না অথবা তাঁর কোনও মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হয় না।

২০০১ সালে অক্টোবর মাসে যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নজিরবিহীন ভাবে সব রকমের অত্যাচার চলছিল, তখন কলকাতার বুকে তার প্রতিবাদে কোনও রাজনৈতিক দল অথবা মানবাধিকার সংগঠন একটি জনসভা অথবা মিছিল করেনি, অথচ সেইসময় সন্ত্রাসবাদী তালিবানীদের শাস্তি দেবার জন্য আমেরিকা কেন আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে তার প্রতিবাদে কলকাতায় বামফ্রন্ট এক মহামিছিল বার করে। শুধু তাই নয়, সেইসময় লোকসভায় এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য যখন প্রস্তাব গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়, তখন বাংলার শাসক দলগুলি এবং প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এই কথা বলে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হলেও তার প্রতিবাদ করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করা চলবে না।

সবশেষে যে উদাহরণটির কথা উল্লেখ করছি তা আরও ভয়াবহ। দিল্লী পুলিশের কাছে খবর আসে যে সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সন্ত্রাসবাদীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা জামিয়ানগরের বাটলা হাউসের চারতলায় আত্মগোপন করে আছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে সন্ত্রাসবাদী দমন শাখার দক্ষ ও কর্তব্য-পরায়ণ ইন্সপেক্টর মোহনচাঁদ শর্মার নেতৃত্বে একদল পুলিশ সেই ঘরে কড়া নাড়িয়ে তাদের দরজা খুলতে বলার পর সেই সন্ত্রাসবাদীরা দরজা খুলেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মোহনচাঁদ শর্মাকে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিরোধে পুলিশ পাল্টা গুলি চালিয়ে দুইজন সন্ত্রাসবাদীকে মেরে ফেলে এবং একজনকে গ্রেফতার করে। এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী যারা বিনা প্ররোচনায় এবং বিনা কারণে আমাদের দেশের নিরপরাধ নরনারী এবং শিশুকে হত্যা করে ভারতবর্ষের একতা, অখণ্ডতাকে নষ্ট করে, ভারতবর্ষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন মুলায়ম সিং যাদব এবং অমর সিং-এর সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলার এক নেত্রী। অমর সিং-এর সঙ্গে জামিয়ানগরে এক জনসভায় এই নেত্রী ঘোষণা করেছেন ৭২ ঘন্টার মধ্যে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে, তিনি এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়বেন। কিন্তু ভারত সরকার তার এই রাষ্ট্রবিরোধী দাবি মেনে নেয়নি।

এখন দেখার বিষয় তিনি কিভাবে এই ঘটনার শেষ দেখবেন।

উপরোক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে এখনও যদি হিন্দু সমাজ এবং সমগ্র ভারতবাসী একজোটে এগিয়ে না আসেন তবে পরাধীনতা এবং আত্মবিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

অবতার পুরুষের পিতা কপিল জনক কর্দম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সৃষ্টি করো। জনক হও তুমি। হও প্রজাপতি। পিতা ব্রহ্মার এই নির্দেশে দ্বিধায় পড়েন ঋষি কর্দম। ব্রহ্মার মানসপুত্র তিনি। বাসনা ব্রহ্মানন্দে বিরাজের। কিন্তু পিতার নির্দেশ! অলঙ্ঘনীয় তা। তাই মনের বাসনা রইল মনেই।

সৃষ্টির প্রায় সেই আদি পর্বে ঋষি কর্দম দুলছেন দ্বিধা আর চিন্তায়। কেমন করে সৃষ্টি করবেন তিনি? কে হবেন মিথুনের সঙ্গী? আর কেমনই বা হবে সে সৃষ্টি? এমনই সব

পরম্পরা

প্রশ্নের বাণে বিক্ষত কর্দম সমাধানের পথ হিসেবে বেছে নিলেন তপস্যাকে।

তপস্যায় বসলেন কর্দম। সরস্বতী নদীর তীরে বিন্দু সরোবরে। দশ হাজার বছর ধরে চলে তাঁর তপস্যা। এক মনে ডেকে চলেন ভগবান হরিকে। প্রার্থনা, কৃপা করো। দেখাও পথ।

সময় যায়। এল সত্যযুগ। প্রসন্ন ভগবান হরি। কৃপা করে দর্শন দিলেন কর্দমকে। সহস্র সূর্যের চেয়েও জ্যোতির্ময়, শ্বেতপদ্মাসনে সুশোভিত, স্নিগ্ধ নীল কুন্তলয়ানিত উজ্জ্বল প্রসন্নবদন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুকে আকাশপথে দর্শন মাত্রই কর্দম হলেন প্রণত। পরম প্রিয়কে এভাবে দর্শন করে তিনি হলেন প্রায় বাকরহিত।

স্তব্ধ যেন সময়, তারপর ভগবানের বন্দনায় মুখর ঋষি। বলেন এ চরাচরে আমার পিতা ব্রহ্মাসহ সব কিছুর উৎস হলেন আপনি। তাই অনুগ্রহ করুন আমাকে। পিতার নির্দেশ, 'সৃষ্টি করো'। সেই নির্দেশ মতো সৃষ্টি করতে চাই আমিও। কিন্তু কে হবেন আমার যোগ্য ভার্যা। তা ঠিক করে দিন আপনিই।

কদর্মের এই প্রার্থনায় স্মিত হাস্যে ভগবান বিষ্ণু বলেন, তোমার তপস্যা শুরুর মুহূর্তেই আমি জেনেছি তোমার বাসনার কথা। তাই সে ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি। আগামী পরশুই এখানে আসবেন এই ধরণীর চক্রবর্তী সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু। সঙ্গে থাকবেন তাঁর সহধর্মিনী দেবী শতরূপা। কন্যা দেবহূতির পাত্র নির্বাচনের জন্য, তাঁরা বেরিয়েছেন ভূ-পরিক্রমায়। এই দেবহূতিই হবে তোমার উপযুক্ত জায়া। তাঁর গর্ভেই জন্ম নেবে তোমার ন'টি কন্যা। সেই নয় কন্যার বিয়ে হবে মরীচি অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিদের সঙ্গে। তাঁদের মাধ্যমেই বিস্তৃত হবে তোমার বংশ। তুমি হবে প্রজাপতি।

আরও শোনো, তোমার তপস্যা আনন্দিত করেছে আমাকে। তাই তোমার একমাত্র পুত্র হয়ে, আমারই অংশ হিসেবে আবির্ভূত হবো আমি স্বয়ং। রচনা করবো এমন এক তত্ত্ব সংহিতার — যা চিরকাল পথ দেখাবে মানুষকে।

এই ভাবে ঋষিকে বর দান করে অন্তর্হিত হলেন ভগবান হরি। পূর্ণকাম ঋষি কর্দম। ভাবী নন্দনের কামনায় নন্দিত হল তাঁর প্রাণ মন। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন স্বপ্ন পূরণের সেই চরম মুহূর্তটির জন্য।

কালচক্রের আবর্তনে মাঝের একটি দিবাবসানের পর এল সেই শুভ দিনটি। বিন্দু সরোবরে ঋষি কর্দমের আশ্রমের সামনে থামল বিশ্বপতি মনুর রথ। স্ত্রী শতরূপা এবং কন্যা দেবাহূতিকে নিয়ে সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু অবতীর্ণ হলেন রথ থেকে। তাঁদের দেখেই ঋষি কর্দম এগিয়ে এলেন। সাদরে বরণ করলেন তাঁদের।

কর্দমের আপ্যায়নে ভীত হলেন মনু। ঋষিকে বললেন, আপনার সব কথাই শুনেছি নারদের কাছে। আর তখনই স্থির করেছি, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের ভগিনী আমার এই কন্যা দেবহূতিকে সমর্পণ করবো আপনার হাতে। আমি জেনেছি দীর্ঘ-তপস্যার পর আপনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই দয়া করে পূর্ণ করুন

আমার এই প্রার্থনা

কর্দম বলেন, আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে আমার সিদ্ধান্ত একটু অন্যরকম। সন্তানের জনক হবার পরই আমি কিন্তু চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করবো। যদি আপনি এবং আপনার কন্যা এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন। তাহলে বিবাহে আপত্তি নেই আমার।

ঋষির কথায় মহারাজ মনু তাকালেন কন্যা দেবহূতির দিকে। নতমুখী কন্যার প্রসন্ন বদনে তিনি দেখলেন সম্মতির ইঙ্গিত। তাই সানন্দে দেবহূতিকে তিনি সম্প্রদান করলেন ঋষি কর্দমের হাতে। মহারানী শতরূপাও কন্যা জামাতাকে দিলেন বহু মূল্যবান উপহার। তারপর তাঁরা বিদায় নিলেন সেখান থেকে।

গৃহস্থ ঋষি কর্দম। কিন্তু সারাক্ষণ সাধন ভজনেই রত। ইন্দ্রিয় তাড়নায় চঞ্চল হয় না তাঁর চিত্ত। আর দেবহুতিও নিষ্ঠার সঙ্গেই সেবা করে যেতে থাকেন অচঞ্চল চিত্তে স্বামীর। ইন্দ্রিয় সুখের কামনাকে করলেন অবদমিত। সংযত চিত্তে দেবহূতি তখন পতি অনুসারিণী। কেটে যায় বহুদিন। তারপর এক দিন ঋষি কর্দম বলেন, দেবহূতি তোমার সেবায় আমি মুগ্ধ। দীর্ঘ তপস্যা করে আমি ভগবানের প্রসাদ লাভ করেছি। আর তুমি একান্তভাবে আমার সেবা করে অনায়াসে পেলে সেই ফল। দেহধর্মকে পীড়ন করে সিদ্ধ হয়েছো তুমি। তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি, তুমি দর্শন করো তাঁকে। স্বামীর প্রণয় ও প্রশ্রয় জড়ানো এসব কথায় দেবহূতি হলেন ব্রীড়াবনতা। মধুর কন্ঠে তিনি বললেন, আমাদের বিয়ের সময় বলছিলে, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে সহবাস করবে তুমি। আজ সন্তানের জন্য উদ্দীপিত আমার হৃদয়। আমার সেই কামনা পূরণ করো তুমি।

হাসলেন ঋষি কর্দম। সৃষ্টির জন্যই তো আবদ্ধ হয়েছেন তিনি বিবাহ বন্ধনে। সেই কাজ তো তাঁকে করতেই হবে। সেটাই তো বিধির বিধান।

সেই বিধান মেনেই ঋষি কর্দম আপন তপস্যা ও প্রজ্ঞার বলে সেখানেই সৃষ্টি করলেন একটি সর্বত্র বিচরণকারী একটি বিমান। সহবাসের নানা উপচার ও উপাধানে সুসজ্জিত তা। সেই বিমান ও তার পরিবেশে কামোদীপ্ত হবে যে কোনও নারীরই মন। কিন্তু দেবহূতির মধ্যে সেরকম উদ্দীপনা না দেখে প্রথমটায় একটু বিস্মিত হলেন ঋষি।

মুহূর্তেই কারণটা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, তোমার মলিন দেহ ও সহবাসের উপযুক্ত বসনভূষণের অভাব তোমাকে পীড়া দিচ্ছে বুঝতে পারছি। তুমি এই বিন্দু সরোবরে অবগাহন করে বিমানে আরোহন করো। দেখবে নর্ম সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত রূপ ও বেশে তুমি হবে মনোহারিণী।

বিন্দু সরোবরে ডুব দিলেন দেবহূতি। মুহূর্তে তিনি পৌঁছালেন পাতালের এক প্রাসাদে। সেখানে আগণিত তরুণী এগিয়ে এলো তাঁর রূপচর্চায়। শোভিত করল তাঁরা তার মিলনের উপযুক্ত বসনে-ভূষণে। তারপর তাঁকে পৌঁছে দিল তার ওই বিমানে কর্দমের কাছে।

কামনায় তাপিত দুটি হৃদয় হল দৃঢ়বদ্ধ। সৃষ্টির জন্য তাঁরা মিলিত হলেন সেই সর্বত্রগামী বিমানে। সেই মিলনের ফলেই ন'টি কন্যার জননী হলেন দেবহূতি।

জন্ম হয়েছে সন্তানের। এবার বিদায় নিতে চাইলেন কর্দম। বাধা দিলেন দেবহূতি। বললেন, মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণের কাজ তো তোমাকেই করতে হবে। তাছাড়া পুত্র না হওয়া পর্যন্ত তো এই সংসার ত্যাগ করা যায় না। তাই উপযুক্ত পুত্রের জন্ম দেওয়া পর্যন্ত সংসারে থাকো, এটাই আমার প্রার্থনা।

পুত্রের জন্ম হওয়া পর্যন্ত যে তাঁকে সংসারে থাকতে হবে একথা জানতো কর্দমও। সেরকমই যে ভগবানের ইচ্ছা। তাই তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন পুত্রের আবির্ভাবের জন্য।

এলো সেই শুভ মুহূর্ত। বিন্দু সরোবরে কর্দম আশ্রমে দেবহূতির গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন ভগবান বিষ্ণুরই অংশ রূপ অবতার পুরুষ কপিল। চারিদিক আমোদিত হল ভগবানের দিব্য আবির্ভাবের প্রভাবে। মরীচি অত্রি প্রভৃতি ছেলেদের নিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মা। সাংখ্য যোগ প্রবর্তনের জন্য ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর পৌত্র কপিল রূপে। একথা ভেবে আনন্দিত ব্রহ্মা বলেন, কর্দম তুমি যেভাবে পিতা ও গুরুর কথা রেখেছো সেটাই আদর্শ হবে তোমার এই পুত্রের। পিতৃ আজ্ঞা পালনের যে আদর্শ স্থাপন করলে তুমি, তার জন্য আশীর্বাদ করছি। এবার তোমার মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দাও মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও অথর্বরলা। তারপর তুমি ত্যাগ করতে পারো এই গার্হস্থ-আশ্রম।

পিতৃ আদেশ পালন করলেন কর্দম। তারপর কপিলরূপী ভগবান বিষ্ণুকে তিনি বলেন, পার্থিব সম্পর্কে তুমি পুত্র, আমি পিতা। কিন্তু পরমার্থিক সম্পর্কে তুমিই আমার পিতা। তুমি পুত্র রূপে আবির্ভূত হওয়ায় আমি দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হলাম। এখন তোমাকেই হৃদয়ে ধারণ করে, আমি এই সংসার আশ্রম ত্যাগ করছি। তুমি আমাকে কৃপা করো। আমার অনুজ্ঞা, তুমিই তোমার মা'কে দেবে আত্মতত্ত্বের দীক্ষা। এসব বলে, পুত্র কপিলকে প্রদক্ষিণ করেন পিতা কর্দম। তারপর সমস্ত কর্মফল বাসুদেবকেই সমর্পণ করে শুভক্ষণে গৃহ ছাড়লেন তিনি। বেরিয়ে পড়লেন অরণ্য পথে, নির্বাসনা হয়ে।

দেবী পুরাণের সিদ্ধান্ত

যে বস্তুগুলি মানুষকে সুখ সম্পদ দেয়, সেগুলির অপব্যবহারই অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মূল সংস্কৃত শ্লোক ঃ যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।

তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন বিবিধান সমুদীরয়েৎ।।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। তারা উভয়েই উভয়কে সারা জীবন ব্যাপী নানা ভাবে সুখ-সম্পদ প্রদান করতে পারে। কিন্তু কোনও পুরুষ যদি নারীকে ভোগ্যপণ্য বলে মনে করে এবং কোনও নারী যদি পুরুষকে শুধু অর্থ উপার্জনের যন্ত্র বলে মনে করে, সেই মতো ব্যবহার করতে চায় তাহলেই অশান্তির সৃষ্টি হয়।

রোদ, জল, বাতাস, কৃষিজমি, পশু, পাখী এ সবই আমাদের সুখ সম্পদ প্রদান করতে পারে। কিন্তু আমরা যদি অতিরিক্ত

সনাতনী শিক্ষা

বিমান চালনা ও অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করে বাতাসে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলি তাহলে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে গিয়ে অতি বেগুনী রশ্মি প্রবেশ করবে। তখন সেই রৌদ্র থেকেই ত্বক ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হবে। একই ভাবে জলাশয়ে কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক ফেললে, কৃষি জমিতে কারখানা করলে, পশু পাখিদের নির্বিচারে নিধন করতে থাকলে, অতিরিক্ত বৃক্ষ ছেদন করলে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়াশুনার অতিরিক্ত বোঝা বাড়ালে — এসব থেকে সুফল লাভের পরিবর্তে কুফল দেখা দেবে। আর বর্তমানে হচ্ছেও তাই।

এইসব বিষয়ে সতর্ক করে অনেক রচনাই প্রকাশিত হচ্ছে। হিন্দু শাস্ত্রে বহু পূর্বেই এ বিষয়ে সতর্ক করে এই শ্লোক রচনা করা হয়েছে।

সোনার পাতে ঢাকা হচ্ছে তিরুপতি মন্দিরের চূড়া

সংবাদদাতা।। তিরুপতির ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরের চূড়াভাগ সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ জন্য ৬০০ কেজি সোনা প্রাথমিকভাবে এ কাজে লাগানো হবে বলে জানা গেছে। আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ছ' শো থেকে এক হাজার কোটি টাকা। ব্যাঙ্গালোরের এক ঠিকাদারকে দিয়ে এই কাজ করাবে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম্ ট্রাস্ট। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'অনন্ত স্বর্ণময়ম্'।

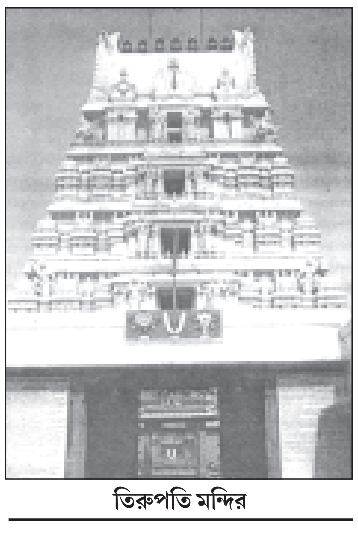

তিরুপতি মন্দির

প্রধান মন্দিরের গোপুরম চূড়াভাগই প্রাথমিক ভাবে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে বলে ঠিক হয়েছে। বাকি অংশ পেতল দিয়ে মোড়া হবে। বর্তমানে দেশে কেবল অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের গর্ভগৃহ আচ্ছাদনকারী চূড়াটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া। এছাড়া ভেলোরের শ্রীপুরম মন্দিরের চূড়া ভাগ সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে। তবে তিরুপতির মন্দিরের প্রধান চূড়া সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়ার সময় তা যাতে বর্তমানে সোনার পাতে মোড়া মন্দিরগুলির থেকে আরও আকর্ষণীয় হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মন্দির কর্তৃপক্ষ এ জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করেননি। তবে আনুমানিক পাঁচ-ছয় বছর সময় লাগবে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের ধারণা।

অঙ্গনা

শিশুর দেখভালে ‘ক্রেশ’ কততা সঙ্গত ?

মিতা রায়

বছরের শেষে, একটা সময় ছিল যখন স্কুলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার হিড়িক পড়ে যেত। শীতের জমাটি আবহাওয়ায় স্কুলে শুরু হয়ে যেত বার্ষিক পরীক্ষা। ফলে গরম-পোশাকে নিজেকে ঢেকে, পড়া তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত ছাত্র-ছাত্রীরা। সময় বদলেছে, বদলেছে চিরকালীন কর্মসূচি। এখন স্কুল পড়ুয়াদের সেই ব্যস্ততা, ভীতি এই সময়টা তেমনভাবে চেপে ধরে না। কিন্তু ইদানিংকালে আবার দেখা যায় কী শীত কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা গতির যুগে চাকরিরতা মায়েদের সঙ্গে চলে বাচ্চাদের দৌড়, চোখ ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই। আবার মায়েদের অফিস ছুটির সময়েই ফিরে আসে মায়েদের সঙ্গে। কোথায় যায় তারা?

হ্যাঁ, সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আজকের গতির যুগে প্রতিটি মানুষ কী পুরুষ কী নারী সকলেই ছুটছে। যৌথ পরিবার ভেঙে তৈরি হয়েছে অণু পরিবার। আবার সেখানেও ভাঙন ধরে তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সংসার। তার উপরে প্রতিটি ঘরেই স্বামী-স্ত্রী চাকুরে। সেক্ষেত্রে তাদের সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মা যেমন বোঝা হয়ে ওঠেন আবার একটি শিশু সন্তানও নিজেকে অসহায় বোধ করে। বৃদ্ধ বাবা-মা'কে দেখভালের জন্য তাই আধুনিক চিন্তাধারায় যেমন গড়ে উঠছে বৃদ্ধাশ্রম, যেখানে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্ত পুত্র-পুত্রবধূ অনেকটাই নিজেদের দায়িত্বমুক্ত মনে করেন, আবার অন্যদিকে ঘরে থাকা অসহায় শিশু সন্তানটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে কর্মস্থলে যেতে চান মায়েরা — আর নিরাপদ আশ্রয়টি হল ‘ক্রেশ’।

শিশুদের ক্রেশে রাখার ধারণা আমাদের সমাজে নতুন এসেছে। যতই মায়েদের কাজ করার প্রবণতা বাড়ছে, ততই ক্রেশের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একটা সময়ে কোনও শিশু তার বাবা-মা'র অবর্তমানে পরিবারের আর পাঁচজনের কাছেই থাকত। তাদের স্নেহে যত্নে আদরে বড় হয়ে উঠত। এখনকার মায়েরা কিন্তু ঠাকুমা-পিসিমাদের কাছে সন্তানকে রেখে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন না। দিনরাতের লোকের কাছে রেখে যাওয়া তো আরও বেশি বিপজ্জনক। সুতরাং ক্রেশের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা খুবই বাড়ছে। কর্মী মায়েরা এইখানে বাচ্চাকে রেখে শুধু নিশ্চিন্তই হন না, আরও পাঁচজনের মাঝে থেকে স্বভাবতই সামাজিক হয়ে উঠবে, মিশতে শিখবে — এটা মনে করেন।

কিন্তু ক্রেশে কি শিশুদের রাখা উচিত — এ নিয়ে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব আছে। কেউ এটাকে সমর্থন করছেন, আবার অনেকে এর বিরোধী। সমর্থনকারীদের মতে, ক্রেশে আর পাঁচটা শিশু আসে। ফলে, তারা তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। যারা বাড়িতে সঙ্গীহীন, তারা সঙ্গ পায়। অন্যান্য অনেক কিছু শিখতে পারে। বেশির ভাগ ক্রেশেই আছে খেলার ছলে পড়া। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা অজান্তে কত কিছু শিখে ফেলে। গত ষাট বছরে আমাদের সমাজে আর্থিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সাধারণত, বাড়ির পরিবেশ, বিশেষত মা-বাবাকে শিশুর সাহচর্য দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে বাবা-মা সমান তালে ছুটছে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে। অথচ সন্তানকে বাড়িতে শুধুমাত্র একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকার কাছে রেখে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করেন না। সুতরাং, সেক্ষেত্রে ক্রেশের ধারণা খুবই সার্থক। এ ব্যাপারে কর্মরতা কিছু মহিলার মতামত জেনে নেওয়া যাক।

আরতি ভট্টাচার্য স্কুল শিক্ষিকা। তিনি জানালেন, চাকরিরতা হওয়ার কারণে ও বাড়িতে অন্য লোক না থাকার জন্য আমার মেয়ের দেখাশোনা করা আমার কাছে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষে মেয়েকে ক্রেশে রেখে আমার নিশ্চিন্ততা বাড়ল। কাজ করতে করতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার প্রয়োজন হল না। সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য অনেক সময়ে চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য পড়াশোনা বা পরীক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু ক্রেশে দেওয়ায় আমার সন্তান ভাল আছে, আনন্দে আছে ভাবলে আমিও মন দিয়ে কাজ করতে পারি। তাই আমি মনে করি, চাকরিরতা মহিলাদের জন্য ক্রেশ উপযুক্ত স্থান।

চাকরিরতা নন, কিন্তু দক্ষ শিল্পী হওয়ায় প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, নানাধরনের যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়। কিন্তু সন্তানকে দেখতে গিয়ে সেসব কাজে ছেদ পড়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সঙ্গীতশিল্পী জানালেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেশে দিলে আমি অনেক কাজ করতে পারি। তাছাড়া বাড়িতে ওকে সঙ্গ দিলেও ও কিন্তু একা। কারণ, ওর সমবয়স্ক কেউ নেই। সেটাও একটা ভাল ব্যাপার যে ক্রেশে আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে।

কিন্তু যিনি নিছক গৃহবধূ তিনি মনে করেন, ক্রেশে বাচ্চা রাখলে শিশু বয়সে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। এটা পরে একটা অভিমান তৈরি করে মায়ের ওপর। নিরুপা দে তাঁর অভিমতে জানালেন — একটি শিশুর কাছে ‘মা’ শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক। সুতরাং মার ক্রোড়ে মার গায়ের গন্ধ পেয়ে সে বড় হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বহিরাগত একজনের কাছে দিনের বেশি সময় অতিবাহিত করার কারণে সে মনে মনে মার ওপর অভিমানী হয়ে পড়ে। ফলে ভবিষ্যতে সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। এই স্তরে দরকার মায়েদের স্বার্থত্যাগ। কারণ, একটি বা দুটি সন্তান যেন সুস্থ, সবল হয়ে ওঠে শরীর ও মনের দিক থেকে। নতুবা বিকৃতমনস্ক হয়ে উঠতে পারে।

আরেকজন প্রবীণা গৃহবধূ, কোনও সময়ে চাকরি করতেন — নীলিমা সেন জানালেন, আমরাও সন্তানকে বাড়িতে রেখে কাজ করতে বেরিয়েছি। কোনও তো অসুবিধে হয়নি। আমার ছেলে খুব ভালোভাবে মানুষ হয়েছে। আজ সে শিক্ষিত, মার্জিত এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তখন তো কোনও ক্রেশ ছিল না। আসলে কি জানেন, আমাদের পারিবারিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। এখন সংসারে ঠাকুমা-দাদু-পিসিদের কোনও কদর নেই। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এখনকার দম্পতিরা। আবার স্বার্থান্বেষী হয়ে পড়ছে। ফলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের বাচ্চার দেখাশোনা অন্য কারোর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। পঙ্গু পরিবারের মানুষ হয়ে এখনকার প্রজন্ম তার আত্মীয় স্বজনদের ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে শিখছে না। ফলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। মা-বাবার ওপরও ছোট থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে।

বিভিন্ন মতামত সাপেক্ষে এটাই বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগের গতিশীলতায় স্বাবলম্বী ও অর্থকরী হওয়ার দৌড়ে যখন বাবার সঙ্গে মাও ছুটছে, তখন একটি সন্তান বা দুই-এর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। তবুও সেক্ষেত্রে তাদের দেখাশোনা, খেলাধূলা, খেলার ছলে পড়াশোনা শেখানোর জন্য ‘ক্রেশ’ গড়ে উঠছে, তখন তার গুরুত্ব অনেকটাই বাড়ছে। তবে সবসময়ে মনে রাখতে হবে কবিগুরুর সেই কথা — বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

চিত্রকথা ॥ ভক্ত ও ভগবান ॥ চব্বিশ

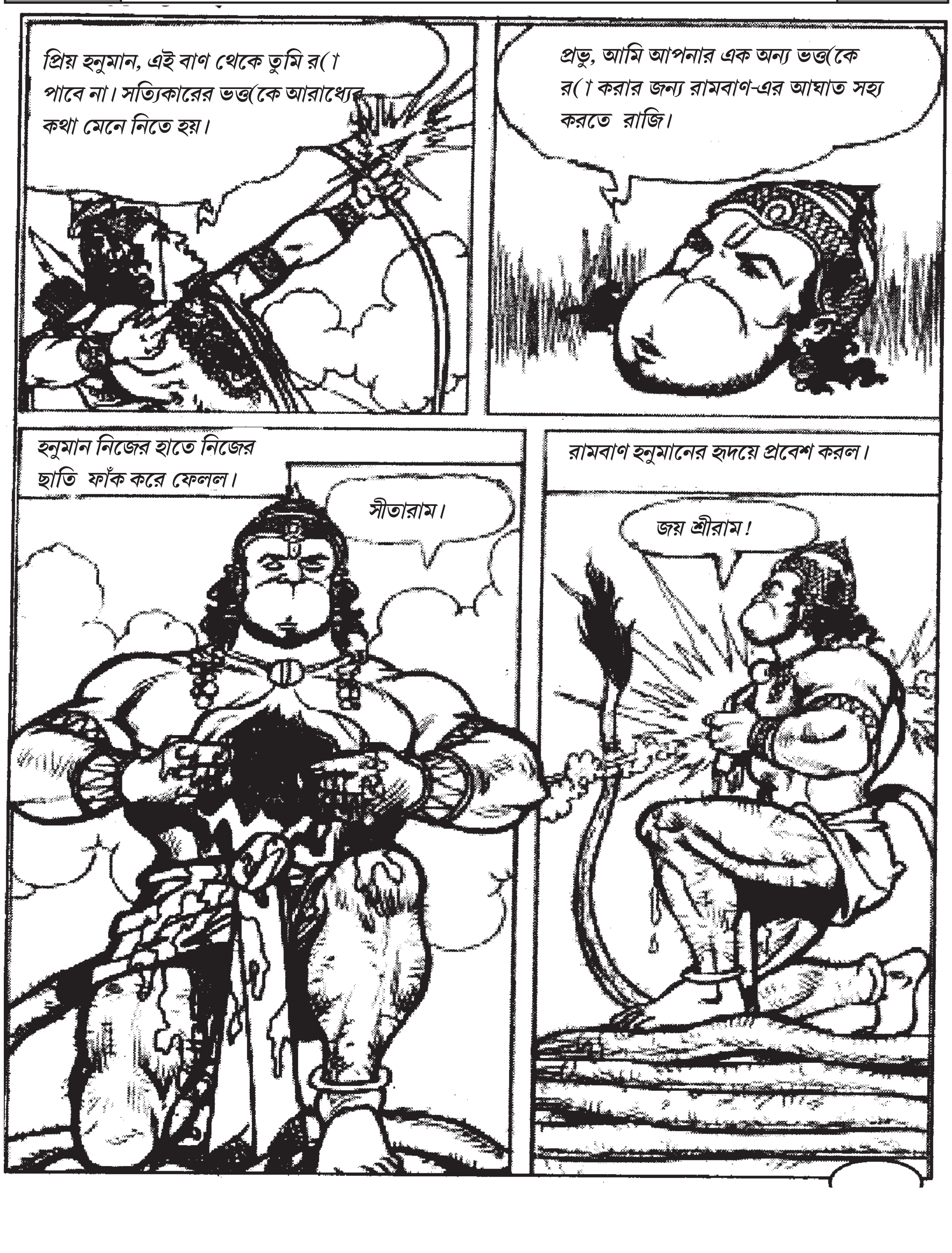

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন।

— ব্যবস্থাপক

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা

কয়েক হাজার তরুণ সামিল বেলডাঙ্গায়

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।। গত ৪ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় পালিত হল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে জগদ্ধাত্রীপূজার রজত জয়ন্তী সমারোহ। সমারোহের প্রধান আকর্ষণ ছিল ধর্মপ্রাণ নরনারীর ধর্মীয় শোভাযাত্রা। ৪ কিলোমিটার ব্যাপী এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল ১২০ টিহরিনামসহ কীর্তনের দল, ঢাক ৫০ ঢোল ৬, টগর ৩/৪ দল এবং অজস্র সাধু-সন্ন্যাসী ও তরতাজা তরুণ সম্প্রদায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের বিরাট ছবিসহ শোভাযাত্রা বেলডাঙ্গা আশ্রম থেকে বেরিয়ে দক্ষিণপাড়া, মাঝপাড়া, পুরাতন বাজার, জনকল্যাণ, ছাপাখানা, পাঁচবাহন ৩৪ নং জাতীয় সড়ক পুরুলিয়া কলোনী হয়ে চিনিকল এলাকা দিয়ে সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে আসে। নবমীর দিন সাধন দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর ২৫ হাজার মানুষ দরিদ্র নারায়ণ সেবায় অংশ নেন। এ দিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সনাতন হিন্দুধর্মের সারবত্তা ও ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বলেন, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সম্প্রতি সিমির কার্যকলাপের তীব্র সমালোচন করেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিমির পক্ষ থেকে বেলডাঙ্গার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয় এবং আশ্রমকে ধ্বংস করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জীবাত্মানন্দজী। পরে দ্বাদশীর দিনে বিশাল সংখ্যক যুবক তরুণের উপস্থিতিতে বিশাল শোভাযাত্রা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে বেলডাঙ্গা নগর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন হয়।

ভারত বিকাশ পরিষদের গীত প্রতিযোগিতা

ভারত বিকাশ পরিষদ-এর উদ্যোগে গত ১৫-১৬ নভেম্বর ভুবনেশ্বরে জাতীয় স্তরে এক সমবেত গীত প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪২টি দলের প্রায় ৪০০ বালক-বালিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সাল থেকে দেশের বালক-বালিকাদের চরিত্র নির্মাণ ও দেশভক্তি জাগরণের লক্ষ্যে পরিষদ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। হিন্দী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং আঞ্চলিক ভাষার গীত প্রতিযোগিতায় বাংলা প্রথম স্থান অধিকার করে।

মুল্লাবেলিয়ায় কালীমন্দির নির্মাণ

সল্টলেক নিবাসী সমাজকর্মী দিলীপ দেব ও তার স্ত্রী রমা দেবের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রূপ পেল। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হরিণঘাটার মুল্লাবেলিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হল সুদৃশ্য শিবমন্দির ও কালীমন্দির। আর দুই মন্দিরের সংযোগস্থলে এক নাটমন্দির। মন্দির উদ্বোধক রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সঞ্জীব দত্তসহ কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন দিলীপ দেব। অনুষ্ঠানে বাড়তি পাওনা ছিল ভবতারিণী সঙ্গীত সমাজ ও বিখ্যাত শিল্পী সুদেব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠাশ্রিত ভাবসঙ্গীত। অনুষ্ঠান শেষে সকল ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মালদায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৭ নভেম্বর 'স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতি'র মালদা শাখা লক্ষ্মণানন্দজীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ মোড়ে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে, জেলাশাসকের নিকট গণডেপুটেশন দেয়। একটি দাবীও পেশ করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন আর এস এস-এর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, বিজেপি-এর বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সঞ্জীব মিশ্র, গোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ।

বিদ্যার্থী পরিষদের মালদা জেলা সম্মেলন

গত ৫ নভেম্বর মালদা শহরের টাউন হলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। সম্মেলনের শেষ দিন একটি মিছিল বের হয়। পথসভার মধ্য দিয়ে মিছিলটি শেষ হয়।

উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক বিল্লেশ্বর সিংহ, মালদা জেলা সভাপতি শ্রাবন্তী চক্রবর্তী এবং সম্পাদক উৎসব চক্রবর্তী।

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বোড়াল প্রভাত শাখার কার্যবাহ প্রদীপ সরকারের পিতৃদেব প্রিয়নাথ সরকার গত ১৫ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা ও দুই পুত্র সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী খাণ্ডুরি

(৭ পাতার পর)

আমরা দিয়েছি পরিবার ভিত্তিক পৃথক আবাসন। আবার অফিসাররা যদি নিজেদের কলোনী গড়তে চান, তবে তাঁদের জন্য জমির বন্দোবস্ত করব আমরা। দেশের প্রথম দিসকার পরমবীর চক্রের প্রাপক এই উত্তরাখণ্ড থেকেই। আমরা সাহসিকতার জন্য পুরস্কারের আর্থিক মূল্য একশগুণ বাড়িয়েছি। সেইসঙ্গে অন্যান্য সুবিধাও।

শু আপনি শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা পেয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?

ত্ত আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করি জাতীয়স্তরে স্বীকৃতির জন্য। প্রথম বৎসরান্তে প্রথমে হিন্দুস্থান টাইমস্ গোষ্ঠী তাদের সমীক্ষায় আমাকে দেশের প্রথম সারির ৬ জন নেতার মধ্যে একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 'ইন্ডিয়া টু-ডে' আমাকে স্বীকৃতি দেয় সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। বর্তমানে আই বি এন-৭ আমাকে পুরস্কৃত করে নিরাপত্তা ও সুবিচারের জন্য। আমি নিরলসভাবে মানুষের সেবা করছি এবং মিডিয়া তারই স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি আরও নিবিড়ভাবে এবং তৎপরতার সঙ্গে জনসেবায় কাজ চালিয়ে যাবার শক্তি যোগাবে।

শু আপনি কি মনে করেন যে রাজ্যের মানুষ যে জন্য এতদিন সংগ্রাম করেছে তা কি আপনি তাদের দিতে পেরেছেন?

ত্ত এতদিন মানুষ লড়ে আসছে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের ওপর। সর্বস্তরে দুর্নীতি, উন্নয়নের খামতি এবং বেকারত্ব। এই তিনটি বিষয়েই আমরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছি। এরাজ্যে কাজ পেতে কাউকে ঘুষ দিতে হয় না বা কারুর উমেদারিতেও কাজ হয় না। আটাশ হাজার শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে যেখানে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি।

(সৌজন্যে — অর্গানাইজার।)

ভাষান্তর — তারক সাহা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব (১২.১.২০০১) উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে তদানীন্তন রাজ্যপাল বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ডাঃ সুজিত ধর ও ভাষণরত মীনাদেবী পুরোহিত। (ফাইল চিত্র)

প্রয়াত অজিত কুমার পাঁজা ও সুজিতদার স্মরণে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সংবাদদাতা ।। গত ১৬ নভেম্বর কলকাতার বাগমারি অঞ্চলে বিবেকানন্দ পাঠচক্রে(র উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবী ডাঃ সুজিত ধরের স্মরণে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। পাঠচক্রে(র সহসভাপতি তুষারকান্তি মজুমদার বলেন, প্রয়াত সুজিতদার প্রেরণায় ২০০১ সালে পাঠচক্রে('ই সি জি' পরিষেবার উদ্বোধন হয়। স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে(আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের ওই অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক বিষ্ণু(কান্ত শাস্ত্রী এবং ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিতও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পাঠচক্রে(র সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুটি শোকপ্রস্তাব পাঠ করে বলেন, শ্রীরামকৃষ্(ণ চরণে নিবেদিত প্রাণ প্রাক্ত(ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজার প্রয়াণে পাঠচক্র(এক অন্তরঙ্গ সুহৃদকে হারালো। উভয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট মৌন পালনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শু(হয়।

সভায় সুভাষ ভট্টাচার্য, ভরত কুণ্ডু, দাশরথি নন্দী, সুদীপ দত্ত, পঙ্কজ ঘোষ, অ(ণেন্দু দত্ত, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ডাঃ তপন পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি(সহ সদস্যরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

আবার এশিয়া সেরা জীব মিলখা সিং

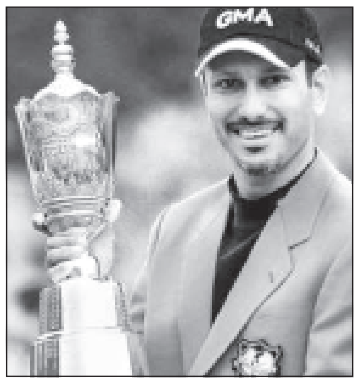

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঙ্গাপুর ওপেন জিতে জীব মিলখা সিং 'এশিয়ান অর্ডার অফ মেরিট' স্বীকৃতির পাশাপাশি নিজের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংও অনেক বাড়িয়ে নিলেন। আবার ঢুকে পড়লেন এলিট পঞ্চাশ তারকার মধ্যে। ভারতের সর্বকালের সেরা অ্যাথালিট মিলখা সিংয়ের কৃচ্ছ্রসাধন যে ব্যর্থ হবার নয়, তা প্রমাণ করতে জীবনের কাছে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ জীব মিলখা, তা তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এক সর্বভারতীয় টিভি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। বাবা বিশ্ববিখ্যাত অ্যাথলিট, মা জাতীয় ভলিবল দলের অধিনায়ক, এমন দম্পতির সন্তানের স্বাভাবিক পরিণতি যে ক্রীড়াবিদ হয়ে ওঠার 'স্টেপিং স্টোন'। আর পাঞ্জাবের মানুষের রক্তে যে খেলাধূলা। এ তো বাংলার নরম-গরম পারিবারিক বাতাবরণ নয় যে জন্মাবার পর থেকেই স্কুলে ছুটতে হবে নিজের ওজনের চেয়ে বেশি বই ব্যাগ বহন করে।

ভারতবর্ষের ক্রীড়া সংস্কৃতিকে কতভাবে না সমৃদ্ধ করেছে পাঞ্জাব। শ'য়ে শ'য়ে অলিম্পিক সোনাজয়ী হকি খেলোয়াড়, অসংখ্য এশিয়াড পদকপ্রাপ্ত অ্যাথলিট,সর্বভারতীয় খ্যতিকীর্তি ফুটবলার বেরিয়েছে যে রাজ্য থেকে, সেই রাজ্যের শেষতম গর্বের অভিজ্ঞান বেজিং অলিম্পিকে প্রথম ব্যক্তিগত সোনাজয়ী ভারতীয় অভিনব বিন্দ্রা ও গলফের আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় শিহরণ সৃষ্টিকারী জীব মিলখা সিংহ। এদের পাশে যুবরাজ সিং, হরভজন সিংয়ের নাম করা যেতে পারে যদিও কোনওভাবেই তুলনা টানা উচিত নয়। তবে পাঞ্জাবে সবুজ কৃষি বিপ্লবের পর এবার ক্রীড়াবিপ্লব চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে। হকির পরিবর্তে পাঞ্জাবের ক্রীড়া গরিমা রক্ষার দায়বদ্ধ তা এখন অভিনব ও জীব মিলখার ওপর ন্যস্ত।

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন বিশ্ব গলফের আসরে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন জীব মিলখা ও জ্যোতি রণ ধাওয়া। গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই জুটি নজর কাড়া শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে উঠতে পারেননি। এবার যে ফর্মে জীব, জ্যোতি দুজনেই আছে তাতে ভারতীয় জুটির কাছে পদক আশা করাই যেতে পারে। সুইংয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও যোগাভ্যাস করে জীব টেকনিক ও টেম্পারেমেন্টের ব্যাপক উন্নতি করেছেন। তার প্রমাণ এ বছর

খেলার জগৎ

মেজর সার্কিটে তিন-তিনটি খেতাব জয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আমেরিকা, ইউরোপের পেশাদার গলফ তারকারা ভারতীয় জুটিকে নিয়ে যে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছেন তা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাটলেই পাওয়া যাবে। জীব মিলখা, জ্যোতি রণধাওয়া, অর্জুন অটওয়াল, গৌরব ঘেই, শিব কাপুর, শিবশঙ্কর চৌরাসিয়া এমন সব ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় গলফার আজ এশিয়া, ইউরোপের মেজর সার্কিটে মর্যাদার সঙ্গে খেলে চলছেন। তবে সবচেয়ে মর্যাদা মণ্ডিত ইউ এস পি জি এ মেজর ট্যুরে খেলার যোগ্যতা অবশ্য এখনো পর্যন্ত পেয়েছেন জীব মিলখা সিং। সিঙ্গাপুর ওপেন জিতে আত্মবিশ্বাসী জীব বলেছেন, ২০০৯ ইউ এস পি জি-এ মেজরে প্রথম দশে চলে আসবেন আর এ ধরনের প্রতিযোগিতায় প্রথম দশে স্থান পাওয়া মানে ভারতীয় গলফের বা ক্রীড়াসংস্কৃতির গৌরববৃদ্ধি নয়, একই সঙ্গে দেখা যাবে ভারতবর্ষের কর্পোরেট বাণিজ্যেও নতুন মাত্রার সংযোজন।

বহু মার্কিন সংস্থা গলফের মাধ্যমে 'মউ' সই করবে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে।

শব্দরূপ - ৪৮৮ বিশাল গুপ্ত

■	১		২	■	৩	■	৪
■		■		■	৫		
৬	■	■	৭			■	
৮				■	■	■	
	■	■	■	৯			
	■	১০			■	■	
১১			■		■	১২	■
	■		■	১৩			■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. "—সঙ্গমে সাতার কেটেছি কত......" (সমুদ্র সমার্থে) ভূপেন হাজারিকা, ৫. — সরসী কেন ভরেছে জলে...." চক্ষু সমার্থে, ৭. চণ্ডিকা দেবীর রূপ বিশেষ, আগাগোড়া পিতৃব্য, ৮. রবি ঠাকুরের "সমাপ্তি" গল্পের মৃন্ময়ীর গ্রামের এক মাঝি, প্রথম দুয়ে অরণ্য, তিনে জননী, ৯. শিবের রুদ্ররূপ, দুয়ে-চারে অবস্থা, ১০. রবি ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস-এর এলার কাকা, শেষ দুয়ে প্রতিশব্দে আমেজ, ১১. বিশেষণে বুদ্ধি মান, কুশল, ১৩. মসলার শুষ্ক ফুলবিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ১. বিশেষণে অশ্রুপূর্ণ, ২. রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ থেকে পরিত্রাণ লাভার্থ-এ এই ঠাকুরে উপাসনা করা হয়, ৩. স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ, হিমালয় পত্নী, গৌরী জননী, ৪. অসুরনাশিনী দুর্গাদেবী, তিনে পাঁচে শক্তি, দুয়ে-চারে পুং নদী, ৬. প্রতিশব্দে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ওয়েদার ফোরকাস্ট, ৯. আরবি শব্দে বিশেষণে বিভোর, তন্ময়, শেষ দুয়ে পোড়া তামাক, ১০. চন্দ্রবংশীয় এই রাজা পৃথিবীতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন, শেষ দুয়ে প্রাচীন যানবিশেষ, ১২. অবয়ব, শরীরের অংশ।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

র	হ	স্যা	লা	প	■	■	ত্রি
■	স্ত	■	■	ন	■	■	নে
■	রে	■	■	স	হ	যা	ত্রা
বা	খা	রি	■	■	ব	■	■
■	■	সা	■	■	ন	মু	চি
বা	ক্য	লা	প	■	■	ক্ত	■
ল্মী	■	■	ঠ	■	■	কে	■
কি	■	■	ন	র	পি	শা	চ

● গত (২৪.১১.০৮) এবং এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

কোচ মারাদোনা কি সফল হবেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশ্ব ফুটবলের 'দেবদূত' দিয়াগো মারাদোনার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। ফুটবলার হিসেবে জীবনে সব পেয়েছেন। বিশ্বকাপ জিতেছেন ও রানার্স হয়েছেন একবার করে। লাতিন আমেরিকান কাপ জিতেছেন বোকা জুনিয়র্সের হয়ে। ফিফার বিচারে তিনবার বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন। সর্বোপরি পেলের পাশে 'হল অফ ফেমে' বসার একমাত্র দাবিদার হিসেবে বিশ্বজনমত ও মিডিয়া মহলের কাছে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে একমাত্র তাঁরই। সর্বকালের সেরা বিশ্ব একাদশ গড়তে হলে পেলে, মারাদোনা, পুসকাসের নাম লিখতে হবে চোখ-কান বুজে। বর্ণময় ফুটবলার, শিল্পী ফুটবলার, জীবনের চেয়ে বড় মাপের ব্যক্তিত্ব মারাদোনা তাবৎ বিশ্বজনমানসের নয়নের মণি। তাঁকে কোচ করে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন ২০১০-এর বিশ্বকাপ বৈতরণী পার হতে চাইছে।

এমনিতেই আর্জেন্টিনার সর্বময় কর্তা জুলিও গ্রেনদোনার সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে মারাদোনার বরাবর। সদ্য বেজিং অলিম্পিক-এ সোনা জয়ী আর্জেন্টিনা নতুন কোচ মারাদোনার অধীনে যে বাড়তি আবেগ ও রোমান্টিক উদ্দীপনা নিয়ে খেলবে তা বলাই বাহুল্য। মার্সেলো বিয়েলসাকে কেন বেজিং সাফল্যের পর সরানো হল তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। তবে বিয়েলসা বেকার হয়ে যাননি। তাঁকে সাদরে বরণ করে জাতীয় কোচ হিসেবে নিয়ে গেছে আর এক লাতিন রাষ্ট্র চিলি। আর তিন-চারজন জাঁদরেল প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে মারাদোনা জাতীয় কোচ হয়ে গেলেন গ্রেনদোনার ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে। সেভাবে ক্লাব কোচিং না করে সরাসরি জাতীয় কোচ হবার দৃষ্টান্তমূলক নজির তাঁর আগে কেউ করে দেখাতে পারেননি।

মারাদোনার আগে তাঁর সমতুল্য বহু ফুটবলার জাতীয় দলের কোচ হয়েছেন। কেউ সাফল্য পেয়েছেন কেউ ব্যর্থ হয়ে চিরকালের মতো ব্রাত্য হয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে দুজন বড় মাপের ফুটবল ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ে। ব্রাজিলের মারিও জাগালো ও জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ফুটবলার ও কোচ হিসাবে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন দেশকে। আর যোদান ক্রুয়েফ, রুড গুলিট, স্বদেশীয় ড্যানিয়েল পাসারেলা বা হালের কার্লোস, দুঙ্গারা যত বড় ফুটবলারই হোন না কেন, স্ট্রাটেজি অনুযায়ী, গেম সিচুয়েশন অনুযায়ী দলকে খেলাতে ব্যর্থ। এদের মতো পরিণতি হোক জীবন শিল্পী মারাদোনার তা কেউই চান না। তবে বাস্তবকে অস্বীকার করলেও চলবে না।

জাতীয় কোচ হিসাবে মারাদোনার প্রথম ও প্রধান কাজ ইউরোপে ক্লাব ফুটবলে খেলা বিভিন্ন তারকার খেলার মধ্যে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তৈরি করে দলের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা। ভিন্ন কোচিং পদ্ধতির মধ্যে খেলে যাওয়া এইসব ফুটবলারের জন্য নির্দিষ্ট কোচিং অনুশাসন বা ম্যানুয়াল চালু করা। তার কাজের ইগো বা অহং ভুলিয়ে দেশের জন্য খেলতে অভিনিবিষ্ট করা ও ম্যান -ম্যানেজমেন্টের দক্ষতায় সব তারকাকে একসূত্রে গেঁথে আর্জেন্টিনার মতো হেভিওয়েট দলকে টেনে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়।

ক্লাব নয় দেশ বড়, এই স্বাজাত্যবোধ দিয়ে খেলোয়াড়দের উদ্দীপ্ত করার পাশাপাশি বিশ্ব ফুটবলের বিভিন্ন কোচিং পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈচিত্র্য গড়ে তোলার মধ্যেই নির্ভর করছে কোচ মারাদোনা ও দল আর্জেন্টিনার সাফল্য। তবে মেসি, রিকলমে, তেভেজরা বড় হয়েছেন মারাদোনার আদর্শে। গুরু বা আদর্শকে কোচ হিসাবে পেয়ে তারা যে বাড়তি তাগিদ ও আবেগ নিয়ে খেলবেন সমস্তরকম ইগো ভুলে সেই ব্যাপারটাই কোচ মারাদোনার কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণা।

ভূটানে নতুন রাজার অভিষেক

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কোন পথে ?

ভূটানে নতুন রাজার অভিষেক — রাজমুকুট পরাচ্ছেন রাজপুরোহিত।

অর্ণব নাগ ।। গণতন্ত্রের দুনিয়ায় সদ্য পা রাখা হিমালয়ের কোলে বেড়ে ওঠা ছোট্ট দেশ ভূটান পেয়ে গেল তার নতুন অভিভাবক। গত ৬ নভেম্বর পঞ্চ ম রাজা হিসেবে রাজ্যাভিষেক হল জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুকের। তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। পড়াশুনো বিলেতের অক্সফোর্ডে। সুতরাং বলাই যায় রাজাদের রাজ্যে তিনি কনিষ্ঠতম বটে! এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে তিনি রাজত্ব লাভ করেছেন যখন রাজতন্ত্র ভাল না গণতন্ত্র শ্রেয় এই সংশয়ের দোলাচল হিমালয় পর্বতমালার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তুলেছে বিতর্কের তুফান। ২০০৬-এর এপ্রিলে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেওয়া আর এক দেশ নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতাচ্যুত হন মাওবাদীদের আন্দোলনে। তার কয়েক মাস আগেই ২০০৫-এর ডিসেম্বরে হিমালয়ের পূর্বদিকে গড়ে ওঠা ভূটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংঘে ওয়াংচুক সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। আভাস দেন সংসদীয় পথে নতুন ভূটান গড়ে তোলার। অকস্মাৎ এই দুই দেশে গণতন্ত্রীকরণের ধাক্কায় কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়ে হিমালয়বাসী। বিশেষ করে ধর্মভীরু ভূটানের নাগরিকদের রাজনীতিকদের দুর্নীতি, আকচা-আকচির পাল্লায় পড়লে দেশের কি হাল হবে ভেবে ঘুম ছুটে যাবার যোগাড় হয়। দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শেষ অবধি আট মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটি দখল করেন জিগমে ওয়াই থিনলে। কিন্তু রাজা যে ভূটানের মজ্জাগত। ভূটানবাসী মনে করেন, 'গণতন্ত্র ভাল কিন্তু সেরা অবশ্যই রাজার অভিভাবকত্ব।' তাই ট্রাডিশনকে স্বীকার করেই পঞ্চ ম রাজা হিসেবে রাজমুকুট উঠে এল ওয়াংচুকের মাথায়। অভিষেকের দিনে ওয়াংচু নদীর তীরে জমা হওয়া কাতারে কাতারে মানুষের জয়গানে মুখরিত হয়ে রইল সুবিশাল হিমালয়ের পূর্বদিকের আকাশ বাতাস। নেপালকে যেখানে চালিত করা হয়েছে ভুলপথে, ভূটানবাসী কিন্তু নিজের ভালটা বুঝল অনায়াসেই।

আসলে জর্ডনের মতো ভূটানেও কলোনিয়াল রাজতন্ত্র বিরাজ করছে। ১৯০৭ সালে বৃটিশদের দ্বারা পতন হয়েছিল এই রাজতন্ত্রের যা আজও বিশ্বে নবযৌবনমুখী রাজতন্ত্র হিসাবে সমাদর পেয়ে আসছে। সেইদিকে দিয়ে দেখলে এই রাজতন্ত্রের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। ঐতিহ্যগতভাবে ভূটানে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম বৌদ্ধিক উপধর্ম সম্প্রদায়গুলি এবং ভূটানী জায়গীরদারদের মধ্যে বরাবরই ছিল। গত ১৬১৬ খৃস্টাব্দে এক তিববতী লামা সাবজুং নাগাওয়াং নামগিয়েল আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক এই যৌথ ভিত্তিতে আধুনিক ভূটান প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে অধিবাসী মঙ্গোলীয় এবং বৌদ্ধিক উপ-ধর্মসম্প্রদায়গুলি পারস্পরিক সংঘাতের রাস্তা থেকে সাময়িকভাবে কিছুটা দূরে সরে আসে। তবে ১৬৫২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পুরো পরিস্থিতিটা পাল্টে যায়। যারা রাজা নাম গিয়েলের সাংগ্রীলা (রাজ্যাভিষেক)-এর ইউটোপিয়ান ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের বিশ্বাসের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর মৃত্যুতে। এরপরের আড়াইশ বছরে ভূটানের ইতিহাস বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে শুধুই যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিববতী বৌদ্ধদের দ্রুকপা কারগুউপা স্কুলের প্রাদেশিক গভর্ণর উগিয়েন ওয়াংচুক দেশ জুড়ে তাঁর প্রভাব ব্যাপকহারে বিস্তার করতে এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গুলিকে এক ছাদের তলায় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এর পুরষ্কারস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকেই রাজা হিসাবে মনোনীত করেন ১৯০৭ সাল নাগাদ। কিন্তু তিনি বা তাঁর উত্তরসূরীরা কেউই সেভাবে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। বিশেষ করে উগিয়েনের নাতি দোরজি ওয়াংচুক তো তথাকথিত আধ্যাত্মিক সঙ্ঘগুলির বেপরোয়া বৃদ্ধি ও ক্রমাগত বিকেন্দ্রীকরণে মদত দিয়ে নিজেকে তো বটেই এমনকী রাজতন্ত্রকেও কঠিন সঙ্কটের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমর্থনে আস্থা ভোটের আদেশ জারি করে টের পেয়ে যন সোগডু (জাতীয় পরিষদ)-তে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর বড় ছেলের বিরুদ্ধে গিয়েছে। তবে একটা কারণে ভূটান রাজা দোরজিকে মনে রাখবে। আজ ভূটান যে গণতন্ত্রের বড়াই করতে পারছে, সেই গোপন ব্যালটে প্রথম ভোটদানের সূচনা করে আজকের ভূটানকে কিন্তু সেদিন এই পথই দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় ১৯৭২ সালে সিংঘে ওয়াংচুক ক্ষমতায় আসার পরে। ক্ষমতায় এসেই তিনি মুঠোয় এনে ফেললেন ভূটান জাতীয় পরিষদের সদস্যদের। এবং ভূটানের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থেই তিনি প্রথমবারের জন্য একটি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এবং জনদরদী হিসেবে ভূটানী জনগণের হৃদয়ে চিরজাগ্রত হয়ে থাকবেন। সেই রাজপরিবারের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সিংহাসনে আরোহন করেছেন নামগিয়েল ওয়াংচুক। জনগণের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার সাথে সাথে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানও কিন্তু তাঁর সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সেইসঙ্গে ভারতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি একই সঙ্গে সতর্ক হতে হবে চীনের থেকে। বিশেষত রাজতন্ত্র বিরোধী চীনের মদতপুষ্ট নেপালের থেকে আসা বিপদের আশঙ্কাকে কোনমতেই এড়াতে পারবেন না নতুন রাজা।

প্রায় দেড় যুগ ধরে উদ্বাস্তু সমস্যার চোরাস্রোত ভূটান ও সেই সাথে সংলগ্ন ভারতীয় এলাকার জনজীবনেও নাভিশ্বাস তুলেছে। এই সমস্যার জন্য দায়ী চতুর্থ রাজা সিংঘে ওয়াংচুক। রাজা হিসেবে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল মূলত শাসকগোষ্ঠী পশ্চি মী জনগোষ্ঠী এনগ্যালংদের প্রতি। অন্যদিকে তাঁর কাছে উপেক্ষিত-ই থেকে গিয়েছিল কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর লোকেরা যেমন সারপে (পূর্বদিকের বাসিন্দারা), এলহটশ্যামপাস (নেপালী বলা দক্ষিণী জনগোষ্ঠী) এবং ডয়াস ও ব্রকপাস (ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংখ্যালঘুরা)। এর ওপর ১৯৮৯ সালে তিনি একটি সাংস্কৃতিক ফরমান জারি করেন যেটিকে বলা হয় 'ড্রিগলাম নামঝা' যার মূল বক্তব্য 'এক জাতি, এক মানুষ'। তিনি একই সাথে একটি তিববতী উপভাষা 'ডিজঙ্খা'কে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেন এবং নেপালী সমেত অন্যান্য ভাষাসমূহকে স্কুলশিক্ষা সহ যাবতীয় পাঠক্রমে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। যখন সেই সাংস্কৃতিক ফরমানের অন্তর্গত যো বা কিরা (লম্বা ঢিলে পোশাক) পরতে অস্বীকার করে এলহটশ্যামপাসরা এবং এর বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন সেই গোষ্ঠীভুক্ত হাজার হাজার মানুষের ওপর অত্যাচার সংঘটিত হয়। রাজশক্তির নির্দেশে জেলে পোরা হয় তাঁদের। ১৯৯০ সালে প্রায় ২ লক্ষ নেপালীভাষী ভূটানবাসীদের বলপূর্বক দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা অবৈধ অভিবাসী এবং 'এনগোলাপস' (জাতীয়তা-বিরোধী)। প্রকৃতপক্ষে ১৬২৪ সাল থেকেই নেপালীরা ভূটানের বাসিন্দা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভূটান সরকার এঁদেরকে শ্রমিকের কাজ এবং স্থাপত্যকর্মে লাগায়। রাজা ওয়াংচুকের ভূটান থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৭০ লক্ষ ভূটানবাসীর মধ্যে ৫০ লক্ষই নেপালী) নেপালীদের একাংশকে তাড়ানোর পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে তা হল ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালে সিকিমের নেপালীরা ইনডিপেনডেন্ট নেশনে ভোটদানের মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রে যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ড্রাগন রাজত্বের অবস্থাও হয়ত সেরকম কিছু হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল।

যাই হোক, এই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে কিছু আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেমন হুত্বণ্ড্রট্রত্ম, রেডক্রস প্রভৃতি। সমস্যা এড়াতে তৃতীয় কোনও দেশে উদ্বাস্তুদের বসবাসের বিষয়টি প্রস্তাব হিসেবে রাখছে তারা। একই সাথে চেষ্টা করছে ভূটানবাসী সেই সমস্ত নেপালী উদ্বাস্তুদের যাতে তাদের দেশে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। গত মে মাসের শেষদিকে ভূটান থেকে নির্বাসিত উদ্বাস্তুরা তাদের আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। সেই সময় তারা সীমারেখা অতিক্রম করার লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে ভূটানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জরুরী অবনমন ঘটে। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধ্য হয় আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে। ঘটনাটি ঘটে ভারতের অন্তর্গত মেচি ব্রিজের ওপর। এই ঘটনা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেইসাথে সরকারকে সমাধানের একটি রাস্তা বের করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় উদ্বাস্তুরা। কারণ ইতিপূর্বে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান যথেষ্ট অবাক করেছিল কূটনীতিকদের। গত ১ জুন বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, নেপালে বসবাসকারী ভূটান থেকে নির্বাসিত নেপালীদের সমস্যা একটি দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। ভারত আশা করছে এই দুই দেশ কথা-বার্তার মাধ্যমে এই মানবিক সমস্যা মিটিয়ে নিতে সমর্থ হবে। কিন্তু এর এক সপ্তাহ পরেই কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী একে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে স্বীকার করে নেন। এমনকী, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও কবুল করতে বাধ্য হন যে উদ্বাস্তু সমস্যার অচলাবস্থা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে। ডঃ এস চন্দ্রশেখরণের মতে, শুরু থেকেই এটি কোনওমতেই দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ছিল না। যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা দক্ষিণ ভূটান থেকে উৎখাত হয়েছিল তারা ভারতের মাটি দিয়েই নেপাল সীমান্ত পার হয়ে নেপালে বসবাস করতে শুরু করেন। আসলে নেপাল থেকে যে অংশ দ্বারা দক্ষিণ ভূটানকে পৃথক করা হয়েছে তা ভারতের অন্তর্গত ৮০ কিমি বিস্তৃত একটি স্থান। সুতরাং এটি কোনওমতেই দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হতে পারে না। এছাড়া দীর্ঘদিনে ধরে নেপাল ও ভূটান উভয় দেশের সঙ্গেই ভারতের বিশেষ কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। যা ভারতকে সুযোগ করে দেবে দু'দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলার এবং একটি আপসে মীমাংসা সূত্র বার করবে বলে আশা করছে কূটনৈতিক মহল। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও একে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য, প্রথমে গোলধপ ও অন্যান্য ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ এই আন্দোলনকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিককালে উদ্বাস্তু নেতাদের মধ্যে দলাদলি, মাওবাদী কমিউনিস্টদের এতে অকারণ হস্তক্ষেপ ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে এই আন্দোলনকে। তবে নতুন রাজা যদি এই সমস্যার সমাধান করতে না পারেন তবে তাঁর প্রকল্পিত জি এন এইচ (মোট জাতীয় সুখ) কিন্তু অধরাই থেকে যাবে।

তবে ভারতকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে আগামী দিনে ভূটান ঠিক কি ধরনের বিদেশনীতি গ্রহণ করে তার ওপর। কারণ চীনের সঙ্গে সীমারেখা নিয়ে গণ্ডগোলের পর থেকেই ভূটান ভারতের Strategic Defence plan হিসাবে কাজ করছে। ১৯৪৯ সালে দু'দেশের মধ্যে যে মিত্রতার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী ভূটানের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। একই সাথে ভূটানও ভারতের উন্নত মানের সামরিকশক্তির ভাগীদার হবে। কিন্তু গত বছর ভূটান সেই সন্ধিপত্র সংশোধিক করে। এবং নতুন রাজা আসার পর চীনের সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এছাড়া ভারত ইতিমধ্যেই ভূটানকে সতর্ক করেছে যে ভারতের কিছু জঙ্গি গোষ্ঠী ভূটানকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এই সতর্কবাণীতে কোনও হেলদোল দূরে থাক বরং ভারতের এই হুঁশিয়ারিকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলার কথা বলেছেন নতুন রাজা।

তবে রাজা নামগিয়েল ওয়াংচুক সম্ভবত এটা ভুলে যাচ্ছেন যার সাথে তিনি সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী সেই চীন কিন্তু রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। তাদের মদতপুষ্ট মাওবাদীরা নেপালী জনগণকে যেভাবে ভুল পথে চালিত করেছেন, ভুল বুঝিয়েছেন এবং ভুল বোঝাচ্ছেন তা ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকবে। সেই একই ইতিহাসের শরিক বোধহয় হতে চাইবেন না ভূটানের মহারাজ!

রাজা নামগিয়েল ওয়াংচুক সম্ভবত এটা ভুলে যাচ্ছেন যার সাথে তিনি সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী সেই চীন কিন্তু রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। তাদের মদতপুষ্ট মাওবাদীরা নেপালী জনগণকে যেভাবে ভুল পথে চালিত করেছেন, ভুল বুঝিয়েছেন এবং ভুল বোঝাচ্ছেন তা ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

Swastika
1 December - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

সরস্বতীর উৎস সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এন ডি এ সরকার যখন ২০০২ সালে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ও পৌরাণিক সরস্বতী নদী প্রকল্পের প্রস্তাবটি নিয়ে এগিয়ে এল, সেই সময় অনেকের চোখে এই প্রকল্পকেইতিহাস অভ্যুদয়ের নামে জনগণের টাকা নয়-ছয়ের ব্যাপার বলে

তাচ্ছিল্য করা হত। সেদিনের সেই সমালোচকদের সন্দেহের ঠুলিটা আজ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলার সময় এসেছে। ঠিক ৬ বছর পরে উল্টো পুরাণ হয়ে সরস্বতী নদী খনন প্রকল্প ফিরে এল। এমনকী তাও হরিয়ানা সরকারের তত্ত্বাবধানে, যা কিনা কংগ্রেস পরিচালিত। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের এই প্রকল্পে ভ্রূকুটি ছিল সব থেকে বেশি। এবং এই প্রকল্পের বর্তমান পদক্ষেপগুলি হরিয়ানা সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে সরস্বতী নদী শোধ সংস্থান (এস এন এস এস) নিতে চলেছে। এই সংস্থানের সভাপতি দর্শন লাল জৈন (আর এস এস-এর হরিয়ানা প্রান্ত সঙ্ঘচালক) এই প্রকল্পের সাথে উল্লেখ্য ভাবে যুক্ত।

গত অক্টোবর মাসে হরিয়ানার কৃষি দপ্তর কুরুক্ষেত্রের ৫২ কিমি জুড়ে (যা পৌরাণিক তথ্যে এই নদীর কুরুক্ষেত্রের প্রবাহিত অংশ হিসেবে দাবীকৃত) খননকার্য ও চিহ্নিতকরণ শেষ করেছে। 'সরস্বতী হল একটি পবিত্র নদী যার গুরুত্ব অপরিসীম' — একথা বলেছেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী ক্যাপ্টেন অজয় সিংহ যাদব। তিনি আরও বলেছেন, উপহগ্রহ থেকে নেওয়া ছবিতে এই নদীর প্রবাহ (অধ্যায়) গুজ্জার নদীর সাথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য সরস্বতীকে একটি যথার্থ নদী হিসেবে প্রবাহিত করানো। কৃষি দপ্তরের আয়োজিত ন্যাশনাল সেমিনারে জৈন ও যাদব উভয়েই সরস্বতী নদীর পুনরুদ্ধার নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, যাতে এই প্রকল্পের কারণগুলি স্পষ্ট হয়েছে। মুখ্যত এই নদীর গভীরতা ত্বরান্বিতকরণ ও হরিয়ানাকে এই নদীর উপত্যকায় ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা। এই প্রকল্পের একটা আধ্যাত্মিক দিক তো রয়েছেই যা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পুণ্যার্থী তথা পর্যটকদের টানতে পারে। এছাড়া আরও একটা বিষয় হল, ভোটব্যাঙ্ক সম্পর্কিত লাভালাভ হরিয়ানা রাজ্যের শাসক দলের পক্ষে বেশ প্রভাবশালী হতে পারে, যেখানে সরস্বতী নদীকে লোকমুখে বলা হয় দরিদ্রের গঙ্গা'। জৈন আরও বলেছেন যে, সমস্ত মানুষই চায় এই নদীর পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণ। এমনকী হরিয়ানা সরকারও এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। সরকারের পক্ষ থেকে সরস্বতী নদী পুনঃপ্রবাহিত করানোর পরিকল্পনা দেওয়া ছাড়াও এস এন এস এস এবং চেন্নাইয়ের সরস্বতী রিসার্চ সেন্টার-এর মতো সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা এখনও পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে ও দাবি করেছে এই নদী হাজার বছর আগে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে কচ্ছের রণ পর্যন্ত বয়ে গেছে। এছাড়া সরকার থেকে একটি 'সরস্বতী উন্নয়ণ সংস্থা' নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাজ্যের কাছে পেশ করা নথিপত্রের মধ্যে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র কিছু মানচিত্র, বৃটিশ আমলের কিছু রাজস্বের দলিল (যাতে এই নদীর অধ্যায়ের কথা বর্ণিত আছে) এবং উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি রয়েছে যেগুলো দেখাচ্ছে নদীর পুরাতন শুকনো গতিপথ। এছাড়া ভৌগোলিক ভাবেও প্রমাণিত হল যে এই প্রাচীন নদীটি হিমালয় থেকে বের হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হরিয়ানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির অধ্যাপক এ আর চৌধুরী বলেছেন, আমরা কিছু তির্যক ঘন খনিজ পেয়েছি যেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে পুরনো নদীপ্রবাহের পথে হরিয়াণাতে পাওয়া নমুনাগুলি থেকে। যেহেতু সেগুলো ধারালো তাই প্রমাণ করে যে একটা বেশ ভারী আয়তনের জল উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বৈদিক তথ্যসূত্রও এই নদীর অবস্থান সম্বন্ধে তাই বলেছে। শ্রীজৈন আর এস এস কর্মকর্তা। তা না জেনেই যাদব মন্তব্য করেছেন, জৈন বা আর এস এস ছাড়াও অন্য অনেক গবেষণা প্রকল্প সরস্বতী নদীর উৎস প্রবাহপথ অনুসন্ধানের কাজ করছেন। আমরা শুধু এর লাভজনক দিকগুলি ভেবেই একাজে এগিয়ে এসেছি। সর্বোপরি উদ্দেশ্য যাই হোক, হিন্দু জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের এহেন উৎস সন্ধান গর্বের বইকি!

শিলিগুড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদের সেমিনার

অনুপ্রবেশকারীরা গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে

অর্ণব নাগ ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে এক গভীর সঙ্কট তৈরি করছে। গত ২৩ নভেম্বর শিলিগুড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত এক জাতীয় আলোচনা সভার উদ্বোধন করে একথা বলেন আর এস এসের কার্যকরী সমিতির সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার। তিনি আরও বলেন, মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহন ভাগবত ও আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তা এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম এবং এ টি এস-এর বানানো গল্প। 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ এক জাতীয় চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এই আলোচনাসভার অন্যতম বক্তা ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। তাঁর কথা, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে যেমন রোম বা প্যারিসেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছাই এই বিপজ্জনক প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সাল থেকে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশের বিপদ নিয়ে চেতনা জাগরণের কাজ করে আসছে।

এই আলোচনায় অন্যান্য অংশ-গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ রামনরেশ সিং, পরিষদের যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক বি সুরেন্দ্রন, পরিষদের রাজ্য সভাপতি রবি রঞ্জন সেন, ক্যাম্প-এর ডিরেক্টর মোহিত রায়, বিমল প্রামাণিক, বিশ্লেশ্বর সিংহ প্রমুখ। শ্রীপ্রামাণিক বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে অনুপ্রবেশ-এর ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

আর এস এস সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না

(১ পাতারপর)

দায়বদ্ধ। সরকারের কাছে যদি সেরকম কোনও খবর বা তথ্য প্রমাণ থাকে তাহলে সত্বর ব্যবস্থা নিক। অথচ সরকারের দিকে সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে সন্দেহ বদ্ধমূল হচ্ছে যে, সরকার মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে জাতির দৃষ্টিকোণ সরিয়ে দিতে চাইছে। দুঃসাহসিকভাবে নারকো টেস্টের অংশবিশেষ লিক করে বরিষ্ঠ আর এস এস নেতা ইন্দ্রেশকুমারকে আই এস আই-এর সঙ্গে যুক্ত বলাও এক ভিত্তিহীন জঘন্য ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। ইন্দ্রেশকুমার আর এস এস-এর বরিষ্ঠ এবং নিবেদিত প্রাণ প্রচারক। তিনি আর এস এস-এর বিভিন্ন দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন, বর্তমানে সঙ্ঘ নেতৃত্বের নির্দেশে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণভাবেই ভিত্তিহীন এবং ধৃষ্টতা মাত্র।

ইন্দ্রেশ কুমার

সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিরন্তর ভ্রমণশীল থাকেন। যে কেউ সহজেই তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারেন। অনেকেই তাঁদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন বিবিধ বিষয়ে।

মালেগাঁও তদন্তে সরকার ও তদন্তকারী সরকারি সংস্থা তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে, জনসাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে এক গভীর ষড়যন্ত্র করে আর এস এস-কে অনর্থক টেনে এনে এক কদর্য ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছে।

আমরা আশা করি, সরকার দৃষ্টি ঘোরানোর এই অপকৌশল বন্ধ করে সন্ত্রাসবাদের দিকেই মনোযোগ দেবেন যা দেশে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

দেশবাসীকে অনুরোধ করেছি, তাঁরা যেন এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য -প্রণোদিত প্রচার করে দেশের হিন্দু সংগঠন ও সাধু-সন্তদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার ব্যাপারটা উপলব্ধি করেন। দেশবাসীদের আরও জানাই যে, তারা যেন সরকার ও এ-টি-এস-র মিথ্যার বেসাতি যা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করছে — তা অবহিত হোন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com